করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ*

মো. জুলকারনাইন, মোরশেদা আকতার, তাসলিমা আকতার, মনজুর ই খোদা

১৫ জুন ২০২০

*সর্বশেষ পরিমার্জিত, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা দল
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোরশেদা আকতার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
তাসলিমা আকতার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মনজুর ই খোদা, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
করোনা ভাইরাস মোকাবিলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাস্থ্যকর্মী, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় নাগরিক যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	৪
সার-সংক্ষেপ	৫
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন	১৮
তৃতীয় অধ্যায়: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ	২৩
চতুর্থ অধ্যায়: করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা	৩১
পঞ্চম অধ্যায়: সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায়: কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ	৪১
সপ্তম অধ্যায়: করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি	৪৪
অষ্টম অধ্যায়: ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি	৫০
নবম অধ্যায়: অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	৫৩
দশম অধ্যায়: করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ	৫৭
একাদশ অধ্যায়: উপসংহার	৬৩

মুখবন্ধ

কোভিড-১৯ একটি প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ, যা করোনা ভাইরাসের নতুন এক প্রজাতির মাধ্যমে মানুষকে আক্রান্ত করছে। ডিসেম্বর ২০১৯-এ প্রথম চীন দেশের উহান প্রদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ৩০ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে এবং পরবর্তীতে মহামারি বা অতিমারি(pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশে মার্চ মাসের শুরুর দিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়, যা বর্তমানে দেশের অন্যতম একটি স্বাস্থ্য সমস্যা এবং দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের ঝুঁকি আরও বেশি। এছাড়া বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় মারাত্মক সংকট তৈরি হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। করোনা ভাইরাস ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করলেও তার বাস্তবায়ন কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং কার্যকর না হলে কেন হচ্ছে না, এক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতিগুলো কী কী, এই অভূতপূর্ব দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত বহুমূখী কার্যক্রম সরকারের ঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী কতটুকু দুর্নীতিমুক্তভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় কী তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সরকারের গৃহীত কার্যক্রম অধিক কার্যকরতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং স্বাস্থ্য খাতে টিআইবি'র গবেষণা ভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রমে প্রাধান্যের ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাসকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এটি এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন। পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আরও প্রতিবেদন প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাস্থ্যকর্মী, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় নাগরিক যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. জুলকারনাইন, মোরশেদা আকতার, তাসলিমা আকতার, এবং মনজুর ই খোদা। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা,অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
(১৫ জুন ২০২০)

সার সংক্ষেপ*

১. গবেষণা প্রেক্ষপট ও যৌক্তিকতা
কোভিড-১৯ একটি সংক্রামক রোগ, যা করোনা ভাইরাসের নতুন একটা প্রজাতির মাধ্যমে মানুষকে আক্রান্ত করছে। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে চীন সরকার উহান প্রদেশে অজানা কারণে নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাবের তথ্য জানায়। ২০২০ সালের ৭ জানুয়ারি চীন এই অজানা নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী হিসেবে একটি নতুন প্রজাতির করোনা ভাইরাসকে চিহ্নিত করে। ৩০ জানুয়ারি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে এবং ১১ মার্চ একে মহামারি বা অতিমারি (pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে।১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশে সর্বমোট ৭৭ লাখ ৬৪ হাজার ৯৭৭ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬৬জন মৃত্যুবরণ করেছে।বাংলাদেশে ২১ জানুয়ারি হতে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়।সর্বপ্রথম ৮ মার্চ ৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়, এবং ১৮ মার্চ সর্বপ্রথম ১ জন মৃত্যুবরণ করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে ১৪ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮৭ হাজার ৫২০জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে১১৭১জন। এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ ১৮তম এবং নতুন রোগী শনাক্ত হওয়ার সংখ্যার দিক হতে ১১ম অবস্থানে রয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের আশংকা অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫ কোটি মানুষ অতি দারিদ্র্যের কবলে পড়বে। এছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আশংকা করছে, করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় ১.১% হারাবে, এবং প্রায় ১ কোটি লোক বেকার হবে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে, করোনার প্রভাবে আয় কমে যাওয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।১০ জুন প্রকাশিত ব্র্যাকের একটি জরিপ অনুযায়ী, সাধারণ ছুটি ঘোষণার কারণে ৯৫% মানুষ উপার্জনের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

করোনা ভাইরাস ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করলেও গণমাধ্যমে সরকারের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, দক্ষতা ও সামর্থ্যইত্যাদি বিষয়ে ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতিপূর্বে টিআইবি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ও জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে।সরকারের গৃহীত কার্যক্রম অধিক কার্যকরতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং স্বাস্থ্য খাতে টিআইবি'র গবেষণাভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রমে প্রাধান্যের ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাসকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য
এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি
এই গবেষণাটি মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর - গুণবাচক ও পরিমাণবাচক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।নিঃসম্ভাবনা (Nonprobability sampling) বা সুবিধাজনক নমুনায়নের (Convenience) মাধ্যমে সারা দেশের সকল বিভাগের মোট ৩৮টি জেলার ৪৭টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল (৯ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,৩৩টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ও ৫টি অন্যান্য হাসপাতাল) হতে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য এবং ৪৩টি জেলা হতে স্থানীয় নাগরিক (সাংবাদিক, শিক্ষক, পেশাজীবী) হতে ত্রাণ বিতরণের প্রত্যক্ষ তথ্য অনলাইন চেকলিস্টের মাধ্যমে সংগ্রহ সংগ্রহ হরা হয়েছে। এছড়া টেলিফোনে মুখ্য তথ্যদাতার (চিকিৎসক ও সাংবাদিক) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য হিসেবেসংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের বহুল প্রচারিত ৬টি গণমাধ্যম (প্রিন্ট) হতে নির্দিষ্ট ছকে ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া জরিপে অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ দেশের সকল ধরণের ভৌগলিক ও অন্যান্য বৈচিত্রকে প্রতিনিধিত্ব

* ২০২০ সালের ১৫ জুন ঢাকায় প্রকাশিত 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

করে। তাই দৈবচয়নভিত্তিক না হলেও বর্তমান জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সার্বিকভাবে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরে।

এই গবেষণায় ১৫ এপ্রিল হতে ১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ের জরিপের তথ্যসমূহ ২০ মে পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণায় আওতা ও বিশ্লেষণ কাঠামো

করোনা ভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত সাতটি বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১. করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন
২. করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম)
৩. করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা)
৪. সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা)
৫. কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন)
৬. করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি
৭. ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

এই গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছেআইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা,এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

২. গবেষণারউল্লেখযোগ্য ফলাফল

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার নানা ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (মুজিব বর্ষের নির্ধারিত অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও নববর্ষ উদযাপন) স্থগিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীস্পষ্ট ভাষায় একাধিকবার দুর্নীতির ক্ষেত্রে ছাড় না দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, এবং পরবর্তীতেপ্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় এক লাখ তিন হাজার ১১৭ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও স্বাস্থ্য বীমার উদ্যোগ গ্রহণ, অতি দরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের জন্য নগদ সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। পূর্বের চেয়ে ২ লক্ষ মে. টন বেশি পরিমাণ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থায় জনবল সংকট মোকাবিলায় চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়াকরোনা সংকটকালীন দ্রব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ছিল।

তবে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

২.১ আইনের শাসনের ঘাটতি

করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দুইটি আইন যথা 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' এবং 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮'- এদের কোনোটিই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং এর অধীনে থাকা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১৯ অনুসরণ না করার ফলে আইন অনুযায়ী বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ ব্যবহার করা যায় নি। ২৩ মার্চ কোভিড-১৯ কে সংক্রামক রোগ হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি হলেও বিলম্বের কারণে আইন প্রয়োগ শুরু হওয়ার আগেই বাংলাদেশে কমিনিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রামক রোগ আইন ২০১৮ অনুসারে সারাদেশকে 'সংক্রমিত এলাকা' বা 'দুর্গত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা না করে 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে ঘোষণা করে, যা মাঠ পর্যায়ে আইনের প্রয়োগ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

২.২ দ্রুত সাড়াদানে বিলম্ব

সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিদেশ হতে আগমন নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি: করোনা ভাইরাসকে অতিমারী হিসেবে ঘোষণা করার পরে বাংলাদেশে প্রায় দুইমাস পর সকল দেশের ফ্লাইট বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ১৫ মার্চ থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দেশের ফ্লাইট বন্ধ করে এবং পরবর্তীতে ২৮ মার্চ হতে চীন ছাড়া সব আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিদেশ হতে প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ২১ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৬ লাখ ২৫ হাজার ৭৪৩ জন যাত্রীর আগমন ঘটে। বাংলাদেশে ২১ জানুয়ারি থেকে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়ের আওতায়

আনা হলেও সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরে হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার দিয়ে যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হয়, যার মাধ্যমে শুধু শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা যায়। ফলে করোনা ভাইরাস আক্রান্তকে কার্যকরভাবে পৃথক করা সম্ভব হয় নি।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কমিটি গঠনে বিলম্ব: ফেব্রুয়ারির শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও বাংলাদেশ প্রায় দেড় মাস পর (১৬ মার্চ) 'কোভিড-১৯ এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়া দান পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে। যার ফলে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এছাড়া সংক্রমণ শুরু হওয়ার দেড়মাস পরে (১৮ এপ্রিল) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়।

অভ্যন্তরীণ চলাচল ও জন-সমাগম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা: সংক্রমণ বিস্তার রোধে ১৭ মার্চ হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা, এবং ২৬ মার্চ হতে সারাদেশব্যাপি ছুটি ঘোষণা করা হলেও এর সাথে সাথে গণ পরিবহণ বন্ধ না করার কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ ঢাকা ত্যাগ করে। এছাড়া বাংলাদেশে সকল ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক গণ জমায়েত নিষিদ্ধ করা হলেও খালেদা জিয়ার জামিন উপলক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীদের জমায়েত এবং মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আতশবাজি পোড়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রেব্যাপক জনসমাগম ঘটে। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংকটকালেই নির্বাচন কমিশন একটি সিটি কর্পোরেশনসহ কয়েকটি সংসদীয় আসনের উপ-নির্বাচন সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দায়িত্বহীন আচরণ করে। পরবর্তীতে ব্যাপক সমালোচনার কারণে কয়েকটি নির্বাচন স্থগিত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের উপসনালয়গুলোতে জমায়েত না করার নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিলম্ব (৬ এপ্রিল) লক্ষ করা যায়।

পরীক্ষাগার প্রস্তুতিতে বিলম্ব: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সকল সন্দেহভাজনের পরীক্ষার বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও ২৫ মার্চ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে মাত্র একটি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। এই সময়ে পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও (এই সময়ে নির্ধারিত হটলাইনে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করে)খুবই কম সংখ্যক পরীক্ষা করা হয় (৭৯৪টি)। ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকার বাইরে পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়২৫ মার্চের পর - ততদিনে সীমিত আকারে কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার শুরু হয়ে গেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতিতে বিলম্ব: করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রস্তুতির দাবি করা হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর প্রায় ৪৪ শতাংশ সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে গিয়েপ্রস্তুতি শুরু করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতা পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বললেও ২১ শতাংশ হাসপাতালের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঘাটতি বা চাহিদা যাচাই করা হয় নি। স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে - মাত্র ২২ শতাংশ হাসপাতালে সকল স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।বিবিজিএনএস ও এসএনএসআর নামক নার্সদের দুটি সংগঠনের একটি জরিপ অনুসারে, দেশের ৮৬ শতাংশ নার্সেরই সংক্রমণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক (আইপিসি) প্রশিক্ষণ নেই।

করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনার সীমাবদ্ধতা: করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার দ্রুততার সাথে ১৯টি প্যাকেজে মোট ১ লাখ তিন হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা (জিডিপির ৩.৩%) করলেও এক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এসব প্রণোদনা মূলত ব্যবসায়ী-বান্ধব, যেখানে সুদ কমিয়ে ঋণ সহায়তা বাড়িয়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে এই সহায়তা পৌঁছানোর নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া এই সকল প্রণোদনায় চাহিদার সংকোচন উত্তরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেই। মৌলিক চাহিদা পূরণে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থ সঞ্চালন বা পর্যাপ্ত নগদ সহায়তার অনুপস্থিতি রয়েছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মহীন পাঁচ কোটি দিনমজুর ও শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মীর জন্য এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয় নি। মাত্র ১০ শতাংশ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে। কৃষি প্রণোদনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের জন্য প্রণোদনার সুযোগ নেই, এবং কৃষি ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেওয়া না হলেও কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্তভোগীদের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্তকরা হয়েছে।

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রস্তুতিতে ঘাটতি: গবেষণাভুক্ত ৪৩টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০ শতাংশ জেলায় ত্রাণ বিতরণের জন্য কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া হয় নি এবং ৭৮ শতাংশ জেলার ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা হালনাগাদ করা হয় নি। এছাড়া অধিকাংশ জেলায় (৮২%) চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম পরিমাণে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণকৃত ত্রাণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জেলায় (৯০%) চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম সংখ্যক উপযুক্ত মানুষ ত্রাণ পেয়েছে।

২.৩ সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি

অকার্যকর কমিটি: করোনা মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নয় ধরনের কমিটি গঠন করা হলেও এসব কমিটির কার্যকরতায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হলেও সেই মিটিং-এ শুধু ডেঙ্গু বিষয়ক আলোচনা করে শেষ করা হয়, পরবর্তীতে এই কমিটির কোনো বৈঠকের তথ্য পাওয়া যায় না। এই কমিটির সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যের অনেক সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত না থাকার বিষয়টি লক্ষ করা গেছে (গার্মেন্টস খোলা ও বন্ধ, ঢাকায় প্রবেশ ইত্যাদি)। এছাড়া জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটিগুলোর কার্যকরতার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সভা নিয়মিত হলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (শপিং মল/ গার্মেন্টস খোলা, লকডাউন প্রত্যাহার করা) কমিটির পরামর্শ উপেক্ষিত থাকা এবং অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাদের ওপর নির্ভরতা লক্ষ করা গেছে।

পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি: বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ হলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম পরীক্ষা হচ্ছে (০.২৯%)। সবসময় বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনা করা হলেও পরীক্ষার হাররের দিক থেকে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম। ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সক্ষমতার ঘাটতির কারণে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি।জাতীয় কলসেন্টার এবং আইইডিসিআর এর নির্ধারিত হটলাইনে ১৪ জুন পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ১০ লক্ষ ফোন কল আসলেও সেই তুলনায় পরীক্ষার সংখ্যা খুবই কম (প্রায় পাঁচ লক্ষ)।বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশইঢাকা-কেন্দ্রিক (৬০টি পরীক্ষাগারের মধ্যে ২৭ ঢাকা শহরের মধ্যে)। সিলেট ও রংপুর বিভাগে দুইটি করে এবং বরিশাল বিভাগে একটি পরীক্ষাগার দিয়ে করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা করা হচ্ছে। বর্তমানে মাত্র ২১টি জেলায় পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে মাত্র ৪১.৩ শতাংশ হাসপাতাল নিজ জেলা থেকেই পরীক্ষা করাতে পারে, বাকি ৪৮.৭ শতাংশ হাসপাতালে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় শহরে বা ঢাকায় পাঠাতে হয়।

টেকনোলজিস্ট সংকট, মেশিন নষ্ট থাকা, জনবল ও মেশিন সংক্রমিত হওয়া ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে মেশিনের সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যাচ্ছে না।বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে নমুনা পরীক্ষা করছে এমন ১৩টি হাসপাতাল ছাড়া ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৬০টি ল্যাবে প্রায় ৮৫টির মতো পিসিআর মেশিন দিয়ে প্রায় ২৪ হাজার নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা থাকলেও সর্বশেষ ১৪ দিনে গড়ে ১৩.৬ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ১৫ মে থকে প্রতিদিন গড়ে ৪ থেকে ৫টি পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না। ২৫ মে তারিখে সর্বোচ্চ ১১টি এবং ১৫ এবং ২৯ মে তারিখে ৮টি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা হয়নি। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর'বি) এর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরীক্ষার জন্য আটটি পিসিআর মেশিন এবং নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী থাকায় অনুমোদন পাওয়ার তারিখ থেকে (৩০ মার্চ, ২০২০) ৩১ মে পর্যন্ত তারা প্রতিদিন ৭০০টি করে দুইমাসে ৪২ হাজার নমুনা পরীক্ষা করতে সক্ষম হলেও তাদেরকে দিয়ে মাত্র ১৫ হাজার ৬৭৮টি পরীক্ষা করানো হয়।

আদালতে একটি মামলা চলমান থাকায় দীর্ঘ ১১ বছর ধরে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জনবল সংকটের কারণে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষায় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে নমুনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ভুল প্রতিবেদন আসছে। এসব ঘাটতির কারণে পরীক্ষাগারগুলোতে সংগৃহীত নমুনা জমা হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নমুনা সংগ্রহ করতে বিলম্ব হচ্ছে।করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ ও প্রতিবেদন দিতে কখনো কখনো ৮ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে,এবং আক্রান্ত ব্যক্তি পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে যোগাযোগে করতে না পারা, নমুনা সংগ্রহ না করা, নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা, দীর্ঘ লাইন, রাস্তায় সারারাত অপেক্ষা, একাধিকবার কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হওয়া, গাদাগাদি করে বসিয়ে রাখা ইত্যাদি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এসব সমস্যার কারণে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫৭ শতাংশ হাসপাতাল প্রয়োজনের চেয়ে অর্ধেক সংখ্যক পরীক্ষা করাতে বাধ্য হচ্ছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের দাবি করলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৭৪.৫ শতাংশেইদক্ষ জনবলের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (৫১.১%), প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (৫৯.৬%) নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী (৫১.১%) ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতার ব্যাপক ঘাটতি উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক হাসপাতালে লক্ষ করা যায়, যা করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ অন্যান্য সাধারণ সেবা কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে সরকারি হাসপাতালগুলোর শয্যাসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে ৩৫০০ আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর থাকার কথা থাকলেও থাকলেও ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ ছিল মাত্র ৪৩২টি; ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের ৪৭টি জেলায় কোনো আইসিইউ সুবিধা ছিল না। করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য ২৫ মার্চ পর্যন্ত সারাদেশে মোট আইসিইউ ছিল মাত্র ২৯টি, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল মাত্র ১৪২টি এবং ১ জুন পর্যন্ত ছিল মাত্র ৩৯৯টি।

২৬ মার্চ পর্যন্ত শুধু রাজধানীর নির্ধারিত ৫টি হাসপাতালে ছিল ২৯টি ভেন্টিলেটর ছিল, যদিও সরকারের দাবি অনুযায়ী এর সংখ্যা ৫০০টি। বর্তমানে সারা দেশে মোট ভেন্টিলেটরের সংখ্যা ১,২৬৭টি - এর মধ্যে মাত্র ১৯০টি করোনার চিকিৎসার জন্য বরাদ্দ করা

হয়েছে, যার মধ্যে ঢাকায় ৭৯টি এবং অন্যান্য জেলা শহরে ১১১টি। ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডনের একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, ৩০ জুনের মধ্যে উচ্চ চাপযুক্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ শয্যার প্রয়োজন হবে প্রায় ২০ হাজার, এবং ভেন্টিলেটরসহ আইসিইউ শয্যার প্রয়োজন হবে ৫,২৫৪টি। ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি হলেও বাংলাদেশে মাত্র ২১টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কোভিড নির্ধারিত হাসপাতালসমূহে ভেন্টিলেটর মেশিন, পেশেন্ট মনিটর, পালস অক্সিমিটার, এবিজি মেশিন উইথ গ্লুকোজ অ্যান্ড ল্যাকটেট, ডিফেব্রিলেটর, ইসিজি মেশিন, পোর্টেবল ভেন্টিলেটর, এসি, ডিহিউমিডিফায়ার, অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদির ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর ৫৩ শতাংশে করোনার প্রভাবে সাধারণ চিকিৎসা সেবায় ব্যাঘাত ঘটছে, যার মধ্যে ৭১ শতাংশ হাসপাতাল জানিয়েছে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের কারণে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী সেবা দেওয়া থেকে বিরত থাকছে বা আক্রান্ত হচ্ছে, ফলে তাদের এই সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার জন্যনির্ধারিত হাসপাতালের চিকিৎসায় প্রস্তুতি ও সক্ষমতার ঘাটতি কারণে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ সাধারণ চিকিৎসা সেবায় নানা ধরনের অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে জনগণের চিকিৎসা সেবা গ্রহণে নানা ধরনের দুর্ভোগ লক্ষ করা গেছে।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: ১১ জুন২০২০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি) সারাদেশে প্রায় ২৩ লাখ পিপিই বিতরণ করেছে বলে দাবি করেছে।এই দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর (প্রায় ৭৫ হাজার)কমপক্ষে ৩০ সেট সুরক্ষা সামগ্রী পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক স্বাস্থ্যকর্মী এখনো একটিও পায় নি বলে হাসপাতাল থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর প্রায় ২৫ শতাংশের সকল চিকিৎসক এবং ৩৪ শতাংশের সকল নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী পিপিই পান নি বলে জানিয়েছেন। এছাড়া অধিকাংশ হাসপাতালের (৬৪.৪%) স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান অনুযায়ী সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ না করার অভিযোগও এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পিপিই সরবরাহ না করে পৃথকভাবে গাউন, গগলস, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস, শু-কাভার, হেড কাভার, ফেস শিল্ড সরবরাহ করা হয়। মানসম্মত ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতির কারণে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৪ জুন পর্যন্ত ৩৮ জন চিকিৎসক এবং সাত জন নার্স মৃত্যুবরণ করেছে, এবং ১,১৯০জন চিকিৎসক ও ১১০২জন নার্স করোনা আক্রান্ত হয়েছে।

এনভায়রনমেন্ট এন্ড স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তাদের একটি গবেষণায় দেখায় যে, করোনা সংকটকালের প্রথম একমাসে ১৪,৫০০ টন সংক্রামক প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয় যার মধ্যে শুধু হাসপাতালগুলো থেকে উৎপন্ন হয় ২৫০ টন। বর্তমানে বাংলাদেশে মাত্র চারটি বিভাগীয় শহরে সীমিত আকারে মেডিক্যাল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা থাকায় এই বিপুল পরিমাণে বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে, এবং এর একটি অংশ একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী পুনরায় ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর মধ্যে প্রায় ৩০% ক্ষেত্রে বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া পিপিই-এর ব্যবহার, ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত ও বিনষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি রয়েছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে সক্ষমতার ঘাটতি: বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিং করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রবেশ পথে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থল, সমুদ্র ও বিমানবন্দরে সাতটি থার্মাল আর্চওয়ে স্ক্যানারের মধ্যে মাত্র একটি সচল ছিল। চীনের উহান-ফেরত ৩১২ জন বাংলাদেশিকে আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। পরবর্তীতে ইতালি-ফেরত ১৬৪ জনকে হজ্জ ক্যাম্পে রাখার সিদ্ধান্ত হলেও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে তাদেরকে পরদিন নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের পরিবর্তে বিদেশফেরত অধিকাংশ প্রবাসীকে নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত বিদেশফেরত যাত্রীদের মাত্র ৮ শতাংশ হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। সচেতনতার ঘাটতি, প্রশাসনের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোম কোয়ারেন্টাইন কার্যকর হয় নি।

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা: সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতার ঘাটতি, কঠোর আইন প্রয়োগের ঘাটতি এবং সরকারের পক্ষ থেকে ভুল ও বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রদানের ফলে সামাজিক দূরত্ব বা লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকর হয় নি। একদিকে আইসোলেশন মানতে বলা হয়েছে আবার অন্যদিকে গণপরিবহণ, কল-কারখানা, শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে। গণ পরিবহণ বন্ধ না করে ছুটি ঘোষণার ফলে প্রায় এক কোটির বেশি মানুষ ঢাকা ছেড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছুটি ঘোষণার পর পোষাক শ্রমিকদের ঢাকা ছেড়ে গ্রামে যাওয়া, গার্মেন্টস খুলে তাদের ঢাকায় ফেরানো, আবার গার্মেন্টস বন্ধ ঘোষণা এবং তাদের ফেরত পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল পুনরায় গার্মেন্টস ও উপাসনালয়, ১০ মে হতে দোকান-পাট, শপিং মল সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া, ঈদের আগে ব্যক্তিগত পরিবহণে আন্তঃ জেলা চলাচল উন্মুক্ত করার মাধ্যমে সার্বিকভাবে লকডাউন পরিস্থিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। ত্রাণ বিতরণে বেশিরভাগ জেলায় (৯৮%) সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি।

২.৪ অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের ঘাটতি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' গঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও তা আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় নি। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে এককভাবে নির্দেশনা প্রদান করছেন। করোনা ভাইরাস মোকাবিলার অন্যতম বিষয় হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা। অথচ এক্ষেত্রে শীর্ষ নীতি-নির্ধারণী জায়গায় কোনো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নেই। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনাকালে বিভিন্ন বিষয়ে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে তা প্রত্যাহার, করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দুই ধরনের তথ্য প্রধান, বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা প্রদান বিষয়ে বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। যেমন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে করোনা হাসপাতাল তৈরির বিষয়ে চারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, এবং সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালেও করোনা চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে তা পরিবর্তন করা হয়।

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা: করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, যোগাযোগ, বাণিজ্য, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যাশিত হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রেখেই ছুটি ঘোষণার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢাকা ত্যাগ, জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানের (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) অগোচরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সারাদেশে কার্যত লকডাউনের মাঝে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঢাকায় ফেরা, গার্মেন্টস খোলা রাখা, মসজিদে জামাতে নামাজ বন্ধ, ঈদের সময় রাস্তা খুলে দেওয়া বা বন্ধ রাখা ইত্যাদি ঘটনা আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার বিষয়টি উন্মোচন করে, যা করোনা সংক্রমণের বিস্তারে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া করোনা প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় কমিটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, যেমন প্রথমে পুলিশের মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে সমালোচনার কারণে কমিটি সংশোধন করে আইজিপিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় ব্যর্থতা: টিআইবি'র সর্বশেষ খানা জরিপে দেখা যায় বাংলাদেশে শতকরা ৭৭.৩ ভাগ পরিবার বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করে। বাংলাদেশে ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রায় ৫ হাজার বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক থাকলেও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসায় তাদের ভূমিকা কী হবে বা তারা কীভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন ও সমন্বয় করা হয়নি বা কোনো ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয় নি। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন করোনা চিকিৎসায় তাদের প্রস্তুতির দাবি করলেও এই বিপর্যয়ের সময়ে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা অন্যান্য চিকিৎসা সেবাও বন্ধ করে দিয়েছে যা বিপুলসংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সকল বেসরকারি হাসপাতালকে একাধিকবার করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দিলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ তদারকির ঘাটতি ছিল।করোনাভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রম সরকারের একক নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদানকরা হলেও (বসুন্ধরার হাসপাতাল স্থাপন, রেমডিসিভির ব্যবহারের অনুমোদন) কোনো কোনো ক্ষেত্রে (গণস্বাস্থ্যর টেস্ট কিট অনুমোদন) বিলম্বিত সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণে এবং সরকারের যথাযথ সহায়তার অভাবে বা বিরোধিতার কারণে বেসরকারি পর্যায়ের বেশ কিছু স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬০ শতাংশ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাওয়ার প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তিরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

২.৫ স্বচ্ছতার ঘাটতি

তথ্য প্রকাশে বিধি-নিষেধ আরোপ: নাগরিকেরসাংবিধানিক অধিকার ও সরকারের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতায় গণমাধ্যমের অবাধ ও মুক্ত ভূমিকা পালনে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতে তথ্য গোপন নয়, তথ্য প্রচারে প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় আরও বেশি অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত অতীব জরুরি। কিন্তু দেশে করোনার প্রকোপ শুরুর পর থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জনসমক্ষে, সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, যা সেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব: দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণে চুরি ও আত্মসাতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পরডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর আওতায় মোট ৬৭টি মামলা দায়ের করা হয়, এবং এই সময়কালে ৩৭ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কার্টুনিস্ট, সাংবাদিকসহ ৭৯টি ঘটনায় মোট ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণা বা গুজব মনিটরিং করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য নজরদারি সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলেও নজরদারি অব্যাহত রয়েছে বলে জানা যায়।

করোন ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি:করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এমন অনেকেই সরকারি হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা না হলে, বা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা মৃত ব্যক্তিদের তথ্য কর্তৃপক্ষকে না জানালে তা সরকারি হিসাবে যোগ হচ্ছে না। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন কবরস্থানে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিদের সৎকারের সংখ্যার মধ্যে অমিল রয়েছে। ফলে করোনা ভাইরাসে মৃতের সরকারি হিসাব নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

২.৬ অনিয়ম ও দুর্নীতি

করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতি: করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলো থেকে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের বিষয়ে (৫৯ শতাংশ হাসপাতালের ক্ষেত্রে)সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠে এসেছে।

চিকিৎসায় অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার অভিযোগ: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৩ শতাংশ হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া যায়। যার মধ্যে করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পাওয়া, স্বাস্থ্যকর্মীদেররোগীদের কাছে না গিয়ে ইন্টারকমে ফোন করে খোঁজখবর নেওয়া, দরজার বাইরে খাবারের প্যাকেট রেখে যাওয়া, রোগীর কক্ষ পরিষ্কার না করা, যথাসময়ে অক্সিজেন সরবরাহ না করা, রোগীর এটেনডেন্টদের দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ বহন করানো, হাসপাতালে ভর্তি রোগী মারা গেলে নমুনা পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, নারী ও পুরষদের একই আইসোলেশন কক্ষে রাখা এবং রোগী মারা গেলেও মৃতদেহ দীর্ঘ সময় না সরানো ইত্যাদি অবহেলা ও অব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য।

পরীক্ষাগারে দুর্নীতি: সরকারের কাছ থেকে বাণিজ্যিকভাবে পরীক্ষার অনুমোদন পাওয়া অধিকাংশ বেসরকারি পরীক্ষাগার করোনা পরীক্ষায় সরকার-নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত ১,০০০ থেকে ১,৫০০ টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগারের সংখ্যা কম থাকায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষার বিষয়টিকে পুঁজি করে বিভিন্ন পরীক্ষাগারের সামনে থাকা দালাল সিরিয়াল বিক্রি করছে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিরা১,০০০ থেকে ১,৫০০ টাকায় এই সিরিয়াল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে‘করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নয়’ এমন সার্টিফিকেট বিক্রি করা হচ্ছে।

চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি: করোনার কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে পাঁচ থেকে ১০ গুণ বাড়তি মূল্যে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করে একটি চক্র লাভবান হচ্ছে এবং এসব মানহীন সামগ্রী হাসপাতালে সরবরাহ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। একটি সিন্ডিকেট বিভিন্ন ফার্মের নামে সব ধরনের ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, এবং এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একাংশের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে এন-৯৫ মাস্ক লেখা মোড়কে সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ এর একটি উদাহরণ।

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে পিপিই, মাস্কসহ বিভিন্ন সামগ্রী একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে। এই ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং কেন্দ্রীয় ঔষধ প্রশাসনের দুই-একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়া অন্যরা কিছুই জানছে না। এতে করে কোনো সামগ্রীর মূল্য কত তা জানা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ সামগ্রী মৌখিক আদেশে সরবরাহ করা হয়েছে। আবার লিখিতভাবে যেসব কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোরও মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।বর্তমানে তীব্র সংকট মোকাবিলায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থে ভেন্টিলেটর আমদানির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও ক্রয় প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অভিযোগে করোনাকালের ১২ সপ্তাহেও ক্রয়াদেশ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া ‘করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জরুরি সহায়তা’ শীর্ষক প্রকল্পে অস্বাভাবিক ক্রয় মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে।বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে প্রতিটি সামগ্রীর মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

একটি হাসপাতালে ব্যবহৃত পিসিআর মেশিন থাকা সত্ত্বেও নতুন পিসিআর মেশিনের ক্রয়ের চাহিদা প্রেরণ করা হয়। এছাড়া স্বাস্থখাত দুর্নীতিগ্রস্ত থাকার কারণে অনেক অবকাঠামো ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়নি। একটি মেডিক্যাল কলেজে ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা চলমান থাকায় পাঁচ বছর অব্যবহৃত অবস্থায় ১৬টি ভেন্টিলেটর পড়ে ছিল। পরবর্তীতে ১০টি সচল করা হয়।পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ করতে সরকারিভাবে ৩১টি আরটি পিসিআর মেশিন ক্রয় করা হয়। করোনা সংকটকালে বিশ্বব্যাপি চাহিদার কারণে সরবরাহকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সালের পুরানো মডেলের পিসিআর মেশিন সরবরাহ করে। মেশিনের ক্রটির কারণে কয়েকটি হাসপাতাল এই মেশিন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কয়েকটি পরীক্ষাগারে বারবার পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার এটা একটি কারণ।

স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা সামগ্রী বণ্টনে অনিয়ম: গবেষণায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলো থেকে নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম চিত্র উঠে আসে। অনেক প্রতিষ্ঠানে মজুদ থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ সামগ্রী বণ্টন করা হয় নি (৭.৭%) এবং নিরাপত্তা

সামগ্রী বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য (৫.১%) অর্থাৎ পছন্দের সহকর্মীদের মধ্যে বা শুধুমাত্র কর্মকর্তা পর্যায়ে সুরক্ষা সামগ্রী বণ্টনের বিষয়টি উঠে এসেছে।

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি: গবেষণা এলাকার শতকরা ৮২ ভাগ এলাকায় সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে,এবং প্রায় ৪২ভাগ এলাকার ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে কোনো তালিকা অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া গবেষণা অন্তর্ভুক্ত এলাকার শতভাগ ক্ষেত্রেই অতি দরিদ্রদের নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে।নগদ সহায়তার তালিকায় বিত্তশালী ও জনপ্রতিনিধিদের সচ্ছল আত্মীয়স্বজনের নাম থাকা এবং একই মোবাইল নম্বর ২০০ জন উপকারভোগীর নামের বিপরীতে ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে। প্রায় সকল গবেষণা এলাকার ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে সামাজিক দূরত্ব না মানার অভিযোগ রয়েছে।

১০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণে ২১৮টি দুর্নীতির ঘটনায় মোট ৪,৫৯,৮৭০ কেজি ত্রাণের চাল উদ্ধার করা হয়েছে। এসব দুর্নীতির ঘটনায় ৮৯ জন প্রতিনিধিকে (ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, জেলা পরিষদ সদস্য, পৌর কাউন্সিলর ইত্যাদি) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। গবেষণাভুক্ত এলাকা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী,এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে মাত্র ৪ শতাংশ এলাকায় জড়িত সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৭ জবাবদিহিতার ঘাটতি

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতির উদ্দেশ্যে কিছু কার্যক্রম সম্প্রসারণ না করে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং এই দুর্যোগকালীন সময়ে অনিয়ম-দুর্নীতি করলেও দায়ী ব্যক্তিদের যথাযথ জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যথাযথভাবে আন্তঃ জেলা চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রারম্ভিক পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করা, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ না করা, এন-৯৫ মাস্ক ক্রয়ে দুর্নীতি, নিম্নমানের পিসিআর মেশিন ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়ী ও জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় নি। উপরন্তু সরবরাহকৃত মাস্ক ও সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণে বিভিন্ন জায়গায় চারজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (বদলি, কারণ দর্শানো নোটিশ, ওএসডি) গ্রহণ করা হয়েছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সীমিত আকারে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা অনেকক্ষেত্রেই লোকদেখানো (যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে দ্রুততার সাথে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের ৬ জন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা, সাময়িক বহিষ্কার), এবং এসব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সরকারি প্রেস ব্রিফিং-এ সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা ও দুর্নীতিগ্রস্তের বদলে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসার প্রবণতা মাধ্যমে প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দীর্ঘসময় ধরে পরিকল্পনাহীনতা, সুশাসনের ঘাটতি ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল সক্ষমতা করোনার সঙ্কটে উন্মোচিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকটভাবে লক্ষ করা গেছে। চীন দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবের পর তিনমাস সময় হাতে পেয়েও করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় এবং সুশাসনের ঘাটতির কারণে দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাঅন্যদিকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ না করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা, এবং কঠোরভাবে চলাচল নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে সংক্রমণ সারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। লকডাউনসহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলা-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

স্বাস্থ্যখাতের ক্রয়ে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণের জন্য করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ব্যাপক সামাজিক সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণের অভাব, এবং মাঠ পর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারণায় ঘাটতির কারণে জনসাধারণে মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় এবং কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। দায়িত্বহীনতা এবং দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষাসামগ্রীর সংকট ও পরবর্তীতে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখিন হয় এবং যা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি করে।

লকডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্রকল্পসমূহ একদিকে ব্যবসায়ীবান্ধব ও ঋণভিত্তিক এবং অন্যদিকে অতি দরিদ্রদের জন্য এই আর্থিক সহায়তা অপ্রতুল। ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ তৈরির কারণে এই প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানোর সম্ভাবনাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

করোনা মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা হচ্ছে এবং দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় না নিয়ে এসে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে হয়রানি ও নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করছে।

৪. সুপারিশ

সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারক কর্তৃক করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

১. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও জনবলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা জেলা পর্যায়ে আরও সম্প্রসারণ করতে হবে, এবং বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
২. বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার ও মৃত্যুর সময়ে লকডাউন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে। লকডাউন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং পরীক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংক্রমণের ব্যাপকতার নিরিখে এলাকাভিত্তিক ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে।
৩. করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. স্বাস্থ্য খাতে জেলা পর্যায়ে সার্বিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে (জিডিপির ৫%), এবং স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে।
৫. স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে অনিয়ম দুর্নীতি রোধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. সকল পর্যায়ের হাসপাতালে স্ক্রিনিং ও ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। সম্মুখ সারির সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
৭. সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে সরকারি বিধির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সকল বেসরকারি হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৮. সকল হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের জন্য নিয়মিত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
১০. অতি দরিদ্র এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, দিনমজুরদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। চলতি কৃষি ঋণ মওকুফ করতে হবে।
১১. ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষার উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। ত্রাণ বা নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
১২. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
১৩. স্বাস্থ্যবিধির সফল বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।
১৪. তথ্য প্রকাশ এবং তথ্যে প্রবেশগম্যতার সুবিধার্থে ও ম্যানেজমেন্টের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের স্বার্থে গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।
১৫. ত্রাণ বিষয়ক দুর্নীতির সাথে জড়িত জনপ্রতিনিধি যাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের আইনগতভাবে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

****

মূল প্রতিবেদন

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ গবেষণা প্রেক্ষপট: করোনা ভাইরাস রোগ বা কোভিড-১৯ একটি সংক্রামক রোগ, যা করোনা ভাইরাসের নতুন একটা প্রজাতির মাধ্যমে মানুষকে আক্রান্ত করছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এ প্রথম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে চীন সরকার উহান প্রদেশে অজানা কারণে নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাবের তথ্য জানায়। ৭ জানুয়ারি ২০২০ চীন এই অজানা নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী হিসেবে একটি নতুন প্রজাতির করোনা ভাইরাসকে চিহ্নিত করে। ৩০ জানুয়ারি ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে এবং ১১ মার্চ২০২০ একে মহামারি বা অতিমারি (pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে।[১] জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির করোনা ভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের তথ্যমতে ১৪ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ১৮৮টি দেশে সর্বমোট ৭৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৭৭ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং চার লক্ষ ২৯ হাজার ৬৬৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে। [২]

বাংলাদেশে ২১ জানুয়ারি হতে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়।[৩] সর্ব প্রথম ৮ মার্চ সর্বপ্রথম ৩ জন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়[4], এবং ১৮ মার্চ সর্বপ্রথম ১ জন মৃত্যুবরণ করে।[৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে ১৪ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮৭ হাজার ৫২০ জন এবং ১ হাজার ১৭১ জন মৃত্যুবরণ করেছে।[৬] আক্রান্তের সংখ্যার হিসেবে ১৩ জুন পর্যন্ত সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ ১৮ তম অবস্থানে রয়েছে এবং নতুন রোগী সনাক্ত হওয়ার সংখ্যার দিক হতে ১১তম অবস্থানে রয়েছে।[৭] ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এই রোগের ঝুঁকি আরও বেশি।

এছাড়া বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকায় মারাত্মক সংকট তৈরি হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের আশংকা অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫ কোটি মানুষ অতি দারিদ্র্যের কবলে পড়বে।[৮] এছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আশংকা করছে, করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় ১.১% হারাবে, এবং প্রায় ১ কোটি লোক বেকার হবে।[৯] বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে, করোনার প্রভাবে আয় কমে যাওয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[১০]

১.৭ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ সমূহ: করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত উল্লেখযোগ্য প্রণোদনার মধ্যে রয়েছে-

- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (মুজিব বর্ষের নির্ধারিত অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও নববর্ষ উদযাপন) স্থগিত
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্পষ্ট ভাষায় একাধিকবার দুর্নীতির ক্ষেত্রে ছাড় না দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা এবং প্রকাশিত অনিয়ম-দুর্নীতির ক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা ঘোষণা - সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় এক লাখ তিন হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা
- স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা ও স্বাস্থ্য বীমা
- অতি দরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের জন্য নগদ সহায়তা প্রদান
- পূর্বের চেয়ে ২ লক্ষ মে. টন বেশি পরিমাণ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

---

[১]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, কোভিড-১৯ টাইমলাইন, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19, ১৬ মে, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত।

[২] জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, করোনা ভাইরাস রিসোর্স সেন্টার, বিস্তারিত দেখুনঃ https://coronavirus.jhu.edu/map.html, ১৪ জুন, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত

[৩] রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১৭ মার্চ ২০২০

[4]রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ৮ মার্চ ২০২০

[৫]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ১৮ মার্চ, ২০২০

[৬]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ১৪ জুন, ২০২০

[৭]Worldometer, ১৪ জুন, ২০২০ তারিখে https://www.worldometers.info/coronavirus/হতে সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ

[৮]Mahler, D. G., Lakner, C., Aguilar, R. C., & Wu, H. 2020, April 20. The impact of COVID-19 (Coronavirus) on global poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit. Retrieved June 14, 2020, from https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest

[৯]দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৫ মার্চ, ২০২০," Minimising the economic impact of Coronavirus in Bangladesh", https://tbsnews.net/thoughts/minimising-economic-impact-coronavirus-bangladesh-56449

[১০]প্রথম আলো, ৭ জুন, ২০২০, “করোনার কারণে দারিদ্র্য বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছেঃ সিপিডি” https://tinyurl.com/y9w5l8lw

- ❖ করোনা সংকটকালীন দ্রব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল রাখা
- ❖ জনবল সংকট মোকাবিলায় চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের উদ্যোগ

১.২ গবেষণা যৌক্তিকতাঃ

করোনা ভাইরাস ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করলেও গণমাধ্যমে এ বিষয়ে সরকারের প্রস্তুতির ঘাটতি, পরিকল্পনার ঘাটতি, দক্ষতা ও সামর্থ্যের ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। ইতিপূর্বে টিআইবি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ও জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে।সরকারের গৃহীত কার্যক্রম অধিক কার্যকরতার সাথে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং স্বাস্থ্য খাতে টিআইবি'র গবেষণা ভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রমে প্রাধান্যের ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাসকে একটি জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে ও সংক্রমণকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতিঃ

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণবাচক ও পরিমাণবাচক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎসঃ নিঃসম্ভাবনা (Nonprobability sampling) নমুনায়ন বা সুবিধাজনক (Convenience)নমুনায়নেরমাধ্যমে দেশের সকল বিভাগের ৩৮টি জেলা হতে ৪৭টি হাসপাতাল (৯ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৩৩টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল ও ৫টি অন্যান্য হাসপাতাল,) হতে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য অনলাইন চেকলিস্টের মাধ্যমে সংগ্রহ হরা হয়েছে। এছাড়া ৪৩টি জেলা হতে স্থানীয় নাগরিক (সাংবাদিক, শিক্ষক, পেশাজীবী) হতে ত্রাণ বিতরণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া টেলিফোন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মূখ্য তথ্যদাতা (চিকিৎসক ও সাংবাদিক) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎসঃ পরোক্ষ তথ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন ও বিধি, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের বহুল প্রচারিত ৬টি গণমাধ্যম (প্রিন্ট) হতে নির্দিষ্ট ছকে ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের সময়ঃ এই গবেষণায় ১৫ এপ্রিল হতে ১৪ জুন ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের জরিপ করা হয়েছে ২০ মে পর্যন্ত।

১.৫ গবেষণায় আওতাঃ করোনা ভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্লোক্ত ৭টি বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

৮. করোনা প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন
৯. করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ (পরীক্ষাগার সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও পরীক্ষা কার্যক্রম)
১০. করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা (হাসপাতালের সক্ষমতা, প্রস্তুতি ও সেবা)
১১. সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (হাসপাতাল পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা)
১২. কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ (স্ক্রিনিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন)
১৩. করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি
১৪. ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

১.৬ বিশ্লেষণ কাঠামোঃ এই গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক সুশাসন নির্দেশকসমূহের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছেআইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা,এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

সারণী: সুশাসন সূচকের আলোকে বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের সূচক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনের শাসন	প্রাসঙ্গিক আইন ও তার অনুসরণ
দ্রুত সাড়াদান	পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, পরীক্ষাগার প্রস্তুতি, পরীক্ষার জন্য যোগাযোগে সাড়াদান, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি, চাহিদা নিরূপণ ও ক্রয় পরিকল্পনা, ত্রাণের উদ্যোগ
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	বিভিন্ন কমিটির ভূমিকা, করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর্মীর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, প্রণোদনা প্যাকেজ
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ - চাহিদা নিরূপণ
জবাবদিহিতা	করোনা প্রতিরোধেপ্রস্তুতি, সংক্রমণরোধে পদক্ষেপ, বেসরকারি চিকিৎসা খাতের ভূমিকা, পোশাক শিল্পখাতের ভূমিকা
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা
অনিয়ম ও দুর্নীতি	স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়, চিকিৎসা ব্যবস্থা, উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, ত্রাণ বিতরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ৭ জানুয়ারি, ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস সংক্রমণকে 'কোভিড-১৯' রোগ হিসেবে ঘোষণা করার পর[১১] করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১০ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে সকল দেশকে একটি সার্বিক কারিগরি নির্দেশনা প্রদান করে। ফেব্রুয়ারির ৩, ২০২০ তারিখে দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দেশসমূহকে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে একটি 'কৌশলগত প্রস্তুতি এবং মোকাবিলা পরিকল্পনা' প্রকাশ করে[১২] এবং যেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সদস্য দেশসমূহকে নিজ দেশের জন্য আটটি বিষয়ে জাতীয় প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করে।[১৩] ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ-নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক দাবী করা হয় যে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সকল ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। এবং বলা হয় যে করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, এটা একটা সাধারণ ফ্লু এর মতো। এছাড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কিটও রয়েছে।[১৪] স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, সারা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ১০ হাজার শয্যার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং আইইডিসিআর থেকে জানানো হয়, সারা দেশের প্রতিটি হাসপাতালে ৫টি করে আইসোলেশন শয্যা প্রস্তত রাখা হয়েছে, এমনি কি উপজেলা পর্যায়েও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।[১৫]

২.১ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন: 'বাংলাদেশে কোভিড-১৯এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা' (National Preparedness and Response Plan for COVID-19, Bangladesh) ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় এবং ওই সরকারি পরিকল্পনা জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা দপ্তর পরিচালিত ওয়েবসাইটে গত ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়।[১৬] এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিদেশ থেকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির সংক্রমণ প্রতিরোধ বা সীমিতকরণ, সংক্রমণ বৃদ্ধি করে এমন বিষয়গুলো প্রতিরোধ এবং সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, সংক্রমণের শুরুতেই আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ, তাদের আইসোলেশন এবং চিকিৎসাসেবা প্রদান, কমিউনিটিতে করোনা বিষয়ক সঠিক তথ্য প্রদান এবং ভুল তথ্যকে প্রতিরোধ, এবং বিভিন্ন খাতের অংশগ্রহণে করোনা ভাইরাসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলা করা।[১৭]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত অনুযায়ী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রণীত জাতীয় পরিকল্পনায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বা বিস্তারের চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করা হয়[১৮]-

১. পর্যায়-১: কোনো সংক্রমণ নেই

২. পর্যায়-২: আক্রান্ত দেশ থেকে সংক্রমিত ব্যক্তির আগমন এবং সীমিত পর্যায়ে ব্যক্তি সংক্রমণ

৩. পর্যায়-৩: এলাকা ভিত্তিক বিস্তার

৪. পর্যায়-৪: কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তার

উল্লিখিত প্রতিটি পর্যায়ে কোভিড মোকাবিলার জন্য গৃহীত ছয়টি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, সমন্বয় ও পরিকল্পনা, রোগ-পরিস্থিতির নজরদারি, ল্যাবেরটরি ব্যবস্থা, দেশে অনুপ্রবেশের স্থানসমূহ নজরদারি, আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ এবং কোয়ারেন্টাইন, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি। তবে এখানে করোনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলা বিষয়ে কোনো কর্মপরিকল্পনা রাখা হয়নি।

---

[১১]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, কৌশলগত প্রস্তুতি ও মোকাবেলা পরিকল্পনা, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, ২৯ মার্চ, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত

[১২]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, কোভিড-১৯ টাইমলাইন, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19, ১৬ মে, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত।

[১৩]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, কৌশলগত প্রস্তুতি ও মোকাবেলা পরিকল্পনা, প্রাগুক্ত

[১৪]বাংলা ট্রিবিউন, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/others/news/608651/

[১৫]বিবিসি বাংলা, ৬ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন, https://www.bbc.com/bengali/news-51772994, ৫ মে, ২০২০ তারিখে সংগৃহীত

[১৬]দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১ এপ্রিল ২০২০, https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/04/01/893271

[১৭]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, 'বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়া দান পরিকল্পনা', ৫ম সংস্করণ, মার্চ, ২০২০

[১৮]বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়া দান পরিকল্পনা, প্রাগুক্ত

২.২ বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বা বিস্তারের পর্যায়ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারমতামত অনুসারে করোন ভাইরাসের যে সংক্রমণ পর্যায়সমূহ পাওয়া যায়[১৯] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সংক্রমণ পর্যায় হচ্ছে-

- **পর্যায়-১ (বাংলাদেশে কোনো সংক্রমণ নেই)ঃ** বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরীক্ষা শুরু হলেও[২০] ৮ মার্চ, ২০২০ এর পূর্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত চিহ্নিত করা যায় নি। বিধায় মার্চ মাসের পূর্ব পর্যন্ত এই পর্যায়কে ধরা যায়।
- **পর্যায়-২ (আক্রান্ত দেশ থেকে সংক্রমিত ব্যক্তির আগমন এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত সংক্রমণ)ঃ** বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রবেশপথগুলো দিয়ে বিদেশ থেকে আগত প্রবাসীদের যথাযথ নজরদারি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ঘাটতি থাকার কারণে নিশ্চিত করে বলা যায় না বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঠিক কবে হয়েছে। ৮ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিনজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়, যার মধ্যে দুইজন বিদেশ থেকে আগত এবং তাদের একজনের সংস্পর্শে আসা একজন নারী। [২১]
- **পর্যায়-৩ (এলাকা ভিত্তিক সংক্রমণ বা কিছু এলাকার মধ্যে সীমিত সংক্রমণ)ঃ**১৩ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে মাদারিপুরের শিবচরে একাধিক ব্যক্তি আক্রান্ত হয় এবং মার্চের ১৯ তারিখ শিবচর লকডাউন করা হয়। প্রথম ১৭ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৮ জন শিবচরের ছিল।[২২] মার্চ মাসের ১৫-১৬ তারিখ হতে ঢাকার টোলারবাগে একাধিক ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন।[২৩] এছাড়া মার্চের ১৫ তারিখে ভৈরবে আইসোলেশনে থাকা একজন বিদেশ ফেরত ব্যক্তির মৃত্যু হয়।[২৪] মার্চ মাসের ৮ তারিখে প্রথম সংক্রমণ চিহ্নিত হওয়ার পর থেকে মার্চ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঘটে অর্থাৎ এই সময়ে বাংলাদেশ করোনা বিস্তারের তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে।
- **পর্যায়-৪ (কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তার বা সংক্রমণ)ঃ** বিশেষজ্ঞ মতে বিদেশ ভ্রমণের ইতিহাস নেই অথবা বিদেশ ফেরত কারও সংস্পর্শে যায় নি এমন কেউ আক্রান্ত হলে তাকে কমিনিউনিটি পর্যায়ের সংক্রমণ হিসেবে বলা যায়।[২৫]অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সংক্রমিত হওয়ার উৎস চিহ্নিত করতে না পারাটা কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণের লক্ষণ। ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে আইইডিসিআর থেকে জানানো হয়দুটি জায়গায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংক্রমণের উৎস চিহ্নিত করা যায়নি। সেদিক থেকে সীমিত আকারে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।[২৬] ঢাকার টোলারবাগে একজন বৃদ্ধ মার্চ মাসের ১৫-১৬ তারিখের দিকে আক্রান্ত হন এবং ২১ তারিখে মারা যান, কিন্তু তার বিদেশ ভ্রমণের ইতিহাস বা বিদেশ ফেরত কারও সংস্পর্শেও আসার ঘটনা ঘটেনি।[২৭] কয়েক জন বিশেষজ্ঞ এই ঘটনাকে কমিউনিটি পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের বিস্তারের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৮] এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি মার্চের ২১ তারিখে বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সুপারিশ করেন।[২৯]যদিও ১৩ এপ্রিল স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয় যে বাংলাদেশে কমিউনিটি পর্যায়ের বিস্তার শুরু হয়ে গেছে[৩০] এবং ১৬ এপ্রিল তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৩১] কিন্তু বিশেষজ্ঞ ও আইইডিসিআর এর মত অনুসারে মার্চের ১৫-২৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশে সীমিত আকারে কমিউনিটি পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঘটেছে।

২.৩ করোনা ভইরাস প্রতিরোধে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিঃ চীনেডিসেম্বর ২০১৯ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে সকল দেশকে প্রস্তুতির জন্য কারিগরি নির্দেশনা প্রদান এবং ফেব্রুয়ারির ৩, ২০২০ তারিখে কৌশলগত প্রস্তুতি এবং মোকাবিলা পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করে। বাংলাদেশ সরকার করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায় ২ মাস সময় হাতে পায়। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ করোনা ভাইরাস মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অতিরঞ্জন করলেও সরকার কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা ও গৃহীত প্রস্তুতিতে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

---

[১৯]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা,Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19, Interim guidance, 22 March 2020
[২০]বাংলা ট্রিবিউন, ১৫ মে, ২০২০, বিস্তারতি দেখুনঃ https://www.banglatribune.com/national/news/623790/
[২১]দৈনিক বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, বাংলা সংস্করণ, ৮ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুননঃ https://tbsnews.net/bangla/
[২২]বিবিসি বাংলা, ১১ মে ২০২০, https://www.bbc.com/bengali/news-52616476
[২৩]বাংলা ট্রিবিউন, ২৩ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.banglatribune.com/others/news/615046/
[২৪]ডয়েচে ভেলে, বাংলা, ২৩ মার্চ, ২০২০, https://www.dw.com/bn/-52887663
[২৫]দৈনিক প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল, ২০২০, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.prothomalo.com/opinion/article/1649069
[২৬]দৈনিক যুগান্তর, ২৬ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/292894/
[২৭]বাংলা ট্রিবিউন, ২৩ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.banglatribune.com/others/news/615046/
[২৮]ডয়েচে ভেলে, বাংলা, ২৫ মার্চ, ২০২০, https://www.dw.com/bn/52914549
[২৯]দৈনিক কালেরকণ্ঠ, ২১ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুনঃhttps://www.kalerkantho.com/online/national/2020/03/21/888714
[৩০]দৈনিক সমকাল, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.samakal.com/bangladesh/article/200418999
[৩১]বিবিসি বাংলা, ১৬ এপ্রিল, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.bbc.com/bengali/news-52314122

২.৩.১ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব:‘বাংলাদেশে কোভিড-১৯এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনা’১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রণয়ন এবং ২৬ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎযখন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তখন বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে ছিল এবং সীমিত আকারে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। যার ফলে প্রথম পর্যায়ের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে এসে বাস্তবায়নের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা প্রকট হয়ে উঠে।

২.৩.২ প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণ না করা: বাংলাদেশ দুর্যোগ ও মহামারী মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দুইটি আইন রয়েছে - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এবং সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে মহামারী সৃষ্টিকারী যে কোনো ব্যাধিকে দুর্যোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[৩২] এই মহামারী মোকাবিলায় এই আইনটি প্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে বিশেষ করে করোনার কারণে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রভাব মোকাবিলায় এই আইন অনুসারে গঠিত বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা যেত। কিন্তু করোনা মোকাবিলায় এই আইনের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়নি। শুধুমাত্র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কয়েকটি কমিটিকে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১৯ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৩৩] বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলায় সংক্রামক রোগ আইন অনুসরণ করা হলেও এ আইন অনুসরণের ক্ষেত্রেও কিছু ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মার্চ মাসের ১ তারিখে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে কিন্তু কোভিড-১৯ কে সংক্রামক রোগ হিসেবে আইনে অন্তভর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ তারিখে।[৩৪] এই ক্ষেত্রেও যখন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় তখন বাংলাদেশে সীমিত পর্যায়ে কমিনিউনিটি সংক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এছাড়া গত ১৬ এপ্রিল ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রামক রোগ আইন অনুসারে সারাদেশকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু এই আইন অনুসারে ‘ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা’ হিসেবে ঘোষণার কোনো সুযোগ নেই, এই আইন অনুসারে ‘সংক্রমিত এলাকা’ অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন অনুসারে ‘দুর্গত এলাকা’ হিসেবে ঘোষণার সুযোগ রয়েছে।[৩৫] সংক্রমিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা না করার মাধ্যমে সংক্রমিত এলাকার মানুষের প্রবেশ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ বা সংক্রমণের বিস্তার রোধে যথাযথভাবে আইন অনুসরণ বা প্রয়োগের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে।

২.৩.৩ বিভিন্ন কমিটি প্রণয়নে বিলম্ব ও এর কার্যকরতার ঘাটতি:করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১ মার্চ ২০২০ তারিখে কয়েক ধরনের কমিটি গঠন করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি, এবং উপজেলা কমিটি।[৩৬] পরবর্তীতে বিভাগীয় পর্যায়, সিটি কর্পোরেশন এলাকা, পৌর এলাকা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে আরও চার ধরনের কমিটি গঠন করা হয়।[৩৭] এছাড়া ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশনায় আটজন জন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে আটটি বিভাগের স্বাস্থ্য কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়[৩৮] এবং ১৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখে দেশের ১৭ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়।[৩৯] এছাড়া আরও কয়েকটি কমিটি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর বাইরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশনায় জেলা প্রশাসকগণকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান ১২ টি কমিটি ও গ্রুপকে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১৯ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৪০] স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক মার্চ মাসের তিন তারিখে অনুষ্ঠিত হলেও সেই মিটিং এ শুধুমাত্র ডেঙ্গু বিষয়ক আলোচনা করে শেষ করা হয়। জাতীয় কমিটির সভাপতিসহ সদস্যদের মধ্যে কেই কেউ সব কিছু সীমিত আকারে খুলে দেওয়া, পোশাক কারখানা খোলা ও বন্ধ করাসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত নন বলে লক্ষ করা গেছে।[৪১] এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলোর প্রস্তুতিমূলক সভা মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও অনুষ্ঠিত হয়নি।[৪২] এসকল কমিটির পরবর্তী বৈঠক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি।

---

[৩২]দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা ২ (১১) (ই)

[৩৩]দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান, ২১ মার্চ, ২০২০, স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০০৩.১৮.০০৪.১৬(অংশ-১)-২৯৮

[৩৪]দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২৪ মার্চ ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/epaper/home/print_version/87230

[৩৫]সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৮, ধারা ১১ (১) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা ২২ (১)

[৩৬]স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন (৪৫.১১০.০২.০০.০০.০১.২০২০-২১০), (৪৫.১১০.০২.০০.০০.০১.২০২০-২১১), (৪৫.১১০.০২.০০.০০.০১.২০২০-২১২)তারিখ: ১.৩.২০২০

[৩৭]স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা, প্রজ্ঞাপন (৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০-১৯৭), (৪৫.০০.০০০০.১৬০.৯৯.০০২.২০-১৯৮), তারিখ: ১৫.৩.২০২০

[৩৮]স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, প্রশাসন অধিশাখা-১, তারিখ: ১৮ মার্চ ২০২০, স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৮.১৯-৫১৯

[৩৯]স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, প্রজ্ঞাপন (৪৫.০০.০০০০.১৪৭.১৬.০০৪.২০-৩২৩), তারিখ: ১৮.৪.২০২০

[৪০]দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, তারিখ-২১.৩.২০২০, স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০৩.১৮.০০৪.১৬(অংশ-১)-২৯৮

[৪১] দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২৯ মে ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/epaper/home/print_version/97467

[৪২]দ্য ডেইলি স্টার, ৬ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net -1876873

বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে কমিটি গঠনের এ ধরনের প্রক্রিয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। অধিক সংখ্যক কমিটি গঠন প্রতিরোধ কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।[৪৩]আইইডিসিআর-এর একজন সাবেক পরিচালকের মতে, করোনার বিরূদ্ধে প্রশাসনিক ও চিকিৎসাসহ সার্বিক এবং সমন্বিত প্রস্তুতিতে ঘাটতি আছে। শুরুর দিকে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে তাতে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। টেকনিক্যাল কমিটিগুলোও ঠিকমতো হয়নি।[৪৪] বাংলাদেশে সংক্রমণ শুরু হওয়ার প্রায় দেড় মাস পরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হলেও এবং এই কমিটি বেশ কয়েকটি সভা করলেও অনেক ক্ষেত্রে এই বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পোশাক কারখানা খোলা ও বন্ধের সিদ্ধান্ত, সাধারণ ছুটি বর্ধিত না করে সীমিত পরিসরে সব কিছু খুলে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে এই কমিটির বিশেষজ্ঞদের মতামতকে উপেক্ষা করা হয়েছে।[৪৫] এছাড়া করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় একই এলাকায় একই ব্যক্তিদের নিয়ে অনাবশ্যকভাবে একাধিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেমন, জেলা পর্যায়ের ‘জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি’ ও ‘কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও প্রতিরোধ কমিটি’ এই দুইটি কমিটিতেই জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জনসহ বিভিন্ন দপ্তরের একই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৩.৪ বেসরকারি পর্যায়ের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতে বিলম্ব: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর একটি জরিপে দেখা যায় বাংলদেশে শতকরা ৭৭.৩ শতাংশ মানুষ বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করে।[৪৬]বাংলাদেশের ৬৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রায় ৫ হাজার বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক থাকলেও[৪৭]করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসায় তাদের ভূমিকা কী হবে বা তারা কীভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন ও সমন্বয় করা হয়নি বা কোনো ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা হয় নি। বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে এই দুর্যোগে চিকিৎসা কাজে যুক্ত করার বদলে তাঁদের ইচ্ছেমতো চলতে দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু এই বিপর্যয়ের সময়ে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবংঅন্যান্য চিকিৎসা সেবাও বন্ধ করে দিয়েছে। তারা রোগীদের ফিরিয়ে দিয়েছে যা বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। যদিও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের দাবী অনুযায়ী বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো সব ধরনের রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।[৪৮]পরবর্তীতে সংক্রমণ শুরু হওয়ার প্রায় আড়াই মাস পরে (২৪ মে, ২০২০) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও[৪৯] এখন পর্যন্ত অধিকাংশ হাসপাতালকে এই নির্দেশনা অমান্য করতে দেখা গেছে।[৫০]সরকার অনেক বিলম্বে (২৯ এপ্রিল, ২০২০) বেসরকারি হাসপতালসমূহকে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য অনুমতি দিলেও তাদের পরীক্ষার সর্বোচ্চ ফি ধরা হয়েছে সাড়ে ৩ হাজার টাকা।[৫১] অর্থাৎ এই হাসপাতালের পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিত্তবানদের জন্য করা হয়েছে। এছাড়া সরকারের যথাযথ সহায়তার অভাবে বা বিরোধিতার কারণে বেসরকারি পর্যায়ের বেশ কিছু স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি; কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখা গেলেও (বসুন্ধরার হাসপাতাল স্থাপন, রেমডিসিভির ব্যবহারের অনুমোদন) ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দিতে অনেক বিলম্ব লক্ষ করা গেছে (গণস্বাস্থ্যর টেস্ট কিট অনুমোদন)।

২.৩.৫ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সক্ষমতায় ঘাটতি পর্যালোচনা না করা:বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাস মোকাবিলার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতা পর্যালোচনার জন্য একটি পর্যালোচনা টুলস্ প্রস্তাবনা করে, যেখানে জাতীয় পর্যায়ের ল্যাবরেটরি ব্যবস্থা, নজরদারি ও ঝুঁকি মুল্যায়ন ব্যবস্থা, দ্রুত সাড়াদান ব্যবস্থা, সমন্বয়, ঝুঁকি বিষয়ক যোগাযোগ, প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং লজিস্টিক ক্রয় ও সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিত ঘাটতি ও ঝুঁকিসমূহের উপর ভিত্তি করে করোনাভাইরাস মোকাবিলা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বলা হয়।[৫২] কিন্তু বাংলাদেশের সক্ষমতার যথাযথ মূল্যায়ন সাপেক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশে যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও জনবল নেই সেখানে বাংলাদেশের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জানান যে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[৪৩]দৈনিক সমকাল, ১১ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/bangladesh/article/200315046

[৪৪]ডয়েচে ভেলে, বাংলা, ১৩ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন-https://www.dw.com/bn/ -52758186

[৪৫] দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২৯ মে ২০২০, প্রাগুক্ত

[৪৬]ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭

[৪৭]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হেলথ বুলেটিন, ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন: https://www.dghs.gov.bd/index.php/bd/

[৪৮]দৈনিক প্রথম আলো, ৯ মে ২০২০, বিস্তারিত দেখুন:https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1655433/

[৪৯]দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২৭ মে ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/home/printnews/220594/2020-05-27

[৫০] দৈনিক সমকাল, ৬ জুন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/bangladesh/article/200625691

[৫১] দৈনিক প্রথম আলো, আলী রিয়াজ, সাধারণেরা ফেরত, ভিআইপিদের বিকল্প হাসপাতাল, ৩০ এপ্রিল, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/opinion/article/1653899/

[৫২]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা,National capacities review tool for a novel coronavirus (nCoV), ১০ জানুয়ারি ২০২০, WHO/2019-nCoV/Readiness/v2020.1

জন হপকিন্স সেন্টার ফর হেলথ সিকিউরিটি কর্তৃক প্রণীত গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০১৯ এ ১৯৫ টি দেশ মহামারি প্রতিরোধ, চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলায় কতটুকু সক্ষম তা ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যায়ন করে। প্রতিরোধ, চিহ্নিতকরণ, দ্রুত সাড়াদান, বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রেক্ষাপট এই ছয়টি বিষয়ে ৩৪ টি সূচকের ভিত্তিতে দেশসমূহের সক্ষমতাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই মূল্যায়নে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ৩৫ নম্বর এবং ১৯৫ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৩ তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ম, বাংলাদেশের পেছনে রয়েছে মালদ্বীপ, শ্রীলংকা এবং আফগানিস্তান। জৈব নিরাপত্তার ঝুঁকি প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার সক্ষমতা, সংক্রমণ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতের সমন্বিত তথ্য, জরুরী পরিস্থিতি মোকাবিলা পরিকল্পনা ও তার চর্চা, জরুরী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সাথে যোগাযোগ, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও সুরক্ষা সামগ্রীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ কোনো স্কোর করতে পারেনি। এছাড়া রোগতাত্ত্বিক কর্মীর সংখ্যা, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশগম্যতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, ঝুঁকি বিষয়ক যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঘাটতি লক্ষণীয়।[৫৩]

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত হেলথ বুলেটিন ২০১৮ অনুসারে বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২২৫৮টি (ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে) এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় রেফারেল হাসপাতালের সংখ্যা ২৫৪ টি (জেলা সদর, বিশেষায়িত ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহ)। এছাড়া বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক ৫,০৫৪টি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনুপাতে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। সরকারি হাসপাতালের মোট শয্যা সংখ্যা ৫২৮০৭ টি এবং বেসরকারি হাসপাতালে ৯০৫৮৭টি। বাংলাদেশে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা তিনটি এবং বেসরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে শয্যা সংখ্যা পাঁচটি। বাংলাদেশে সকল ধরনের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর সর্বমোট সংখ্যা ৭৪৯৮৫, চিকিৎসকের সংখ্যা ২০৯১৪ জন (২৫৯৮০ পদের বিপরীতে), সর্বমোট নিবন্ধিত চিকিৎসকের সংখ্যা ৯৩৩৫৮ জন এবং মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টের (ল্যাব) সংখ্যা ১৪৮৮ (২২৩৭ পদের বিপরীতে)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী চিকিৎসা সেবার কাঙ্খিত লক্ষমাত্রা অর্জনে একটি দেশে প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যার জন্য ২৩ জন চিকিৎসক ও নার্স থাকা উচিত।[৫৪] অথচ বাংলাদেশে প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যার জন্য সরকারি চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র একজন এবং সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক মিলিয়ে মাত্র ছয় জন চিকিৎসক রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যার জন্য নার্সের সংখ্যা চার জন।[৫৫] এছাড়া প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যার জন্য সরকারি টেকনোলজিস্ট আছে মাত্র ০.৩২ জন।[৫৬]

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অসুস্থতা গুরুতর হয়ে শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুসের সমস্যা দেখা দিলে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি বেশিরভাগ হাসপাতালেই নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটের (আইসিইউ) ঘাটতি রয়েছে। একটি দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের ধরন অনুযায়ী শয্যা অনুপাতে পাঁচ থেকে ১২ শতাংশ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট(ICU) থাকা উচিত। বাংলাদেশে বাংলাদেশে সাধারণ শয্যার অনুপাতে আইসিইউ শয্যার ২১৯:১ যা হওয়া উচিত ১০:১।[৫৭]সেই হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালের ৫২৮০৭ টি শয্যার অনুপাতে সরকারি আইসিইউ শয্যার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হওয়া উচিত। কিন্তু করোনা সংক্রমণ শুরুর সময় বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট আইসিইউ শয্যা ছিল মাত্র ১,১৬৯টি। এর মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ছিল ৪৩২টি (ঢাকায় ৩২২, ঢাকার বাইরে ১১০) আর বেসরকারি হাসপাতালে ৭৩৭টি (ঢাকা মহানগরীতে ৪৯৪, ঢাকা জেলায় ২৬৭, অন্যান্য জেলায় ২৪৩)।[৫৮]

উপসংহার: চীনে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়ে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এবং এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতার পর বাংলাদেশ ২-৩ মাস সময় পেলেও চিকিৎসা ব্যবস্থায় এবং মহামারি মোকাবিলার বিদ্যমান ঘাটতিসমূহ পর্যালোচনা সাপেক্ষে সংক্রমণ প্রতিরোধ, চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। বরং সকল ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বলে সবাইকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় অনেক বিলম্বে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম শুরু করা হলেও কাজের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণ না করা, গঠিত কমিটিগুলোর কার্যকরতায় ঘাটতি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা ও বেসরকারি

[৫৩]জন হপকিন্স সেন্টার ফর হেলথ সিকিউরিটি এবং নিউক্লিয়ার থ্রেট ইনিশিয়েটিভস, গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স, ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন:https://www.ghsindex.org/

[৫৪]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, The Global Health Observatory, বিস্তারিত দেখুন; https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/85, ২০ মে ২০২০ তারিখে সংগৃহীত

[৫৫]বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, Global health workforce statistics, 2018, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/hrh/statistics/ , ২০ মে ২০২০ তারিখে সংগৃহীত

[৫৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হেলথ বুলেটিন ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন: https://dghs.gov.bd/index.php/en/

[৫৭]Mostafa N. Critical Care Medicine: Bangladesh Perspective. *Adv J Emerg Med*. 2018;2(3):e27. Published 2018 Jan 9. doi:10.22114/AJEM.v0i0.79

[৫৮]বিবিসি, বাংলা, ২৫ জানুয়ারি, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-52018765

পর্যায়ের সম্পৃক্ততায় ঘাটতির কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণ শুরু করতে করতেই করোনা ভাইরাসের কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তার লাভ শুরু হয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ

সন্দেহভাজন আক্রান্ত ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ চিহ্নিত করার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথমত, ভাইরাস যাতে অগোচরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই জন্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এছাড়া ভাইরাসের সংক্রমণ কতটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে, সংক্রমণের ব্যাপকতা অনুসারে চিকিৎসা ব্যবস্থার আরও কতটুকু সম্প্রসারণ প্রয়োজন, সামাজিক দূরত্ব কোন মাত্রায় বজায় রাখতে হবে, কোথায় লকডাউন করা প্রয়োজন বা কোথায় লকডাউন তুলে দেওয়া যায় সে সকল বিষয়ে অবগত হওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যাপক পরিমাণে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস গেব্রেইয়েসুসজেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, “সব দেশের প্রতি আমাদের সাধারণ একটি বার্তা- টেস্ট টেস্ট টেস্ট। ভাইরাস যাতে অগোচরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তাই সব সন্দেহভাজনের পরীক্ষার করতে হবে।[৫৯]

৩.১ পরীক্ষাগার প্রস্তুতি: বাংলাদেশে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ২১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরীক্ষা করা শুরু করে।[৬০] বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৫৬ টি পরীক্ষাগারে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা হচ্ছে যার মধ্যে ঢাকা শহরে ২৬টি এবং ঢাকা শহরের বাইরে ৩০টি পরীক্ষাগার রয়েছে। পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে ১৭টি বেসরকারি পর্যায়ের পরীক্ষাগার রয়েছে যার মধ্যে ১৩টি বাণিজ্যিকভাবে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করছে।[৬১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করলেও বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস পরীক্ষাগারের প্রস্তুতী ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

৩.২ পরীক্ষাগার প্রস্তুতিতে ঘাটতি: মার্চের মাঝামাঝি সময় হতে সীমিত পর্যায়ে করোনা ভাইরাস কমিউনিটি পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়লেও[৬২] মার্চের ২৫ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র একটি পরীক্ষাগার দিয়ে পরীক্ষার কাজ চালানো হয়। মার্চের ২৫ তারিখে প্রথমবারের মতো ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) এর পরীক্ষাগারে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরীক্ষা শুরু হয়।[৬৩] এই সময়কালে আইইডিসিআর এর কাছে টেস্ট কিটের মজুদ ছিল মাত্র ২০০০টি।[৬৪]

সারণী: বিভাগ ভিত্তিক পরীক্ষাগারের কার্যক্রম শুরুর সময়কাল[৬৫]

বিভাগ	ল্যাব পরীক্ষার শুরু	পরীক্ষাগারের সংখ্যা (১১ জুন, ২০২০ পর্যন্ত)
ঢাকা	২১ জানুয়ারি, ২০২০	৩৪
চট্টগ্রাম	২৫ মার্চ, ২০২০	৭
রাজশাহী	১ এপ্রিল, ২০২০	৪
খুলনা	৭ এপ্রিল, ২০২০	৩
বরিশাল	৯ এপ্রিল, ২০২০	১
সিলেট	৭ এপ্রিল, ২০২০	২
রংপুর	১ এপ্রিল, ২০২০	২
ময়মনসিংহ	১ এপ্রিল, ২০২০	৩
মোট		৫৬টি

মার্চের ২৫ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকার বাইরে কোনো পরীক্ষাগার ছিল না। আইইডিসিআর বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এনে ঢাকায় টেস্ট করাতো। মার্চের ২০ তারিখে একজন ভাইরোলজিস্ট বলেন, ‘‘বাংলাদেশে করোনার জন্য নির্ধারিত একটি পরীক্ষাগার মোটেই যথেষ্ট নয়। পরীক্ষা করা হচ্ছে না বলে আক্রান্ত ব্যক্তি ধরা পড়ছেনা। পরীক্ষাগারের প্রস্তুতি আগেই করা

[৫৯]দেশ রূপান্তর, ১৭ মার্চ, ২০২০, https://www.deshrupantor.com/international/2020/03/17/205030
[৬০]ডয়েচে ভেলে, ২৫ মার্চ ২০২০, https://www.dw.com/bn/-52914549
[৬১]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে
[৬২]ডয়েচে ভেলে, বাংলা, ২৫ মার্চ, ২০২০, প্রাগুক্ত
[৬৩]দৈনিক সমকাল, ২০ এপ্রিল, ২০২০, https://m.samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200436478
[৬৪]ডয়েচে ভেলে, ২০ মার্চ ২০২০, https://www.dw.com/bn/-52855858
[৬৫]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে

উচিত ছিল। সরকার বিভাগীয় শহরে যে টেস্টের কথা বলছে সেটা আসলে নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআর-এ এনেই পরীক্ষা করা। আমাদের যে সেটআপ আছে, তাতে ৪-৫টি ল্যাব করা সম্ভব। কিন্তু আইইডিসিআর সেটা করছে না। কেন করছেনা তারাই জানেন।[৬৬] এই সময়কালে করোনা পরীক্ষার ব্যাপক চাহিদা লক্ষ করা যায়। সন্দেহভাজন আক্রান্ত ব্যক্তিদের অনেকে চেষ্টা করেও করোনা শনাক্তকরণ পরীক্ষা করাতে পারেনি। যারা পরীক্ষা করিয়েছিল তাদের অনেকেই যথা সময়ে ফলাফল জানতে পারেনি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় স্বাস্থ্য বাতায়ন, জাতীয় কলসেন্টার এবং আইইডিসিআর এর নির্ধারতি হটলাইনে মার্চের ২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রায় চার লক্ষ ৮৮ হাজার মানুষ করোনা ভাইরাস বিষয়ক সেবার জন্য কল করে এবং শুধুমাত্র আইইডিসিআর এ কল করা হয় প্রায় ৬০ হাজার কিন্তু এই সময়কালে পরীক্ষা করা হয় মাত্র ৭৬৪টি।[৬৭] আইইডিসিআর টেলিফোনে রোগীর ইতিহাস শুনে অর্থাৎ বিদেশ থেকে যারা এসেছে বা যারা তাদের সংস্পর্শে এসেছে শুধুমাত্র তাদের পরীক্ষার জন্য বাছাই করতো।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ল্যাব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখের পূর্বে অন্যান্য বিভাগে কোনো পরীক্ষাগারের কার্যক্রম শুরু করা হয় নাই। বর্তমানেও ঢাকার বাইরে ল্যাবের কার্যক্রম খুবই সীমিত। জেলা হিসেবে ৬৪টি জেলার মধ্যে বর্তমানে মাত্র ২১টি জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে মাত্র ৪১.৩ শতাংশ হাসপাতাল নিজ জেলা থেকেই পরীক্ষা করাতে পারে বাকী ৪৮.৭ শতাংশ হাসপাতালে সংগ্রহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় শহরে বা ঢাকায় পাঠাতে হয়।

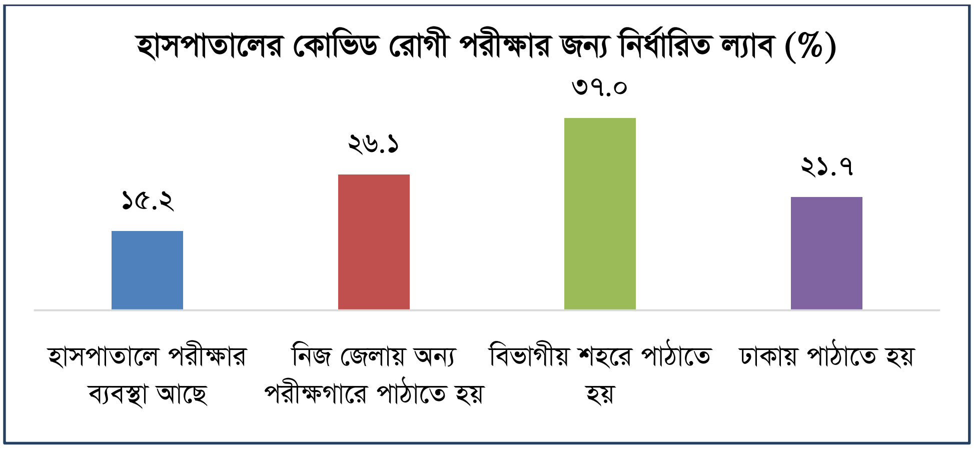

বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৬টি ল্যাব কার্যকর থাকলেও এর অধিকাংশের কার্যক্রম শুরু হয় এপ্রিল মাস থেকে। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য বিভাগের পরীক্ষাগারের কার্যক্রমও মূলত শুরু হয় এপ্রিল মাস থেকে। বিভাগগুলোর মধ্যে সিলেট, রংপুর এবং বরিশাল বিভাগে পরীক্ষাগারের সংখ্যা খুবই কম। এই বিভাগ তিনটিতে যথাক্রমে ২টি, ২টি এবং একটি পরীক্ষাগার দিয়ে করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সারণী: সময়কাল ধরে পরীক্ষাগারের সংখ্যা[৬৮]

সময়কাল	ঢাকা শহর কেন্দ্রিক	ঢাকার বাইরে	পরীক্ষাগারের ক্রমবর্ধিত যোগফল
১৫ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত	১	-	১
৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত	৬	১	৭
১৫ এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত	৯	৮	১৭
৩০ এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত	১৩	১৭	৩০
১৫ মে, ২০২০ পর্যন্ত	২০	২১	৪১

[৬৬]ডয়েচে ভেলে, ২০ মার্চ ২০২০, প্রাগুক্ত

[৬৭]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[৬৮]প্রাগুক্ত

৩১ মে, ২০২০ পর্যন্ত	২৬	২৬	৪৮
১১ জুন, ২০২০ পর্যন্ত	২৬	৩০	৫৬

৩.৩ পরীক্ষাগারের সক্ষমতা: করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম অনেক বিলম্বে হলেও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে নমুনা পরীক্ষা করছে এমন ১৩টি হাসপাতাল ব্যতিত ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ৬০টি ল্যাবে প্রায় ৮৫টির[৬৯] মতো পিসিআর মেশিন দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে অধিকাংশ পিসিআর মেশিন একব্যাচে ৯৬ টি নমুনা পরীক্ষা করতে পারে এবং এতে ৫-৬ ঘন্টা সময় লাগে। এভাবে দিনে চারবার পরীক্ষা করা যায়।[৭০] তবে বিশেষজ্ঞমতে পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল থাকলে একটি মেশিনে দিনে তিনবার পরীক্ষা করা যায়।[৭১]সেই হিসেবে তিন শিফটে নমুনা পরীক্ষা করা হয় তাহলে বর্তমানে ব্যবহৃত মেশিনগুলো দিয়ে একদিনে প্রায় ২৪ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব।

৩.৪ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত পরীক্ষা: সরকারি ও বেসরকারি অন্যান্য পরীক্ষাগার যথাযথ নিয়ম মেনে পরীক্ষা করতে পারবে না এবং ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে এই অজুহাতে দীর্ঘদিন আইইডিসিআর এককভাবে পরীক্ষার কর্তৃত্ব নিজেদের কাছে রেখে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের পরীক্ষা করে আসছিল।[৭২] পরবর্তীতে অনেক বিলম্বে পরীক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ হলেও দক্ষ জনবল সংকট, মেশিন নষ্ট থাকা, পরীক্ষাগার এবং জনবল সংক্রামিত হওয়া, সমন্বয়ের ঘাটতি ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বিদ্যমান সক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বর্তমানে প্রায় ২৪ হাজার নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা থাকলেও সর্বশেষ ১৪ দিনে গড়ে ১৩.৬ হাজার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় স্বাস্থ্য বাতায়ন, জাতীয় কলসেন্টার এবং আইইডিসিআর এর নির্ধারতি হটলাইনে ১১ জুন পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ১০ লক্ষ ফোন কল আসে, যাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কি ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে বা মানুষ কি কারণে হটলাইনে যোগাযোগ করেছে সে বিষয়ক তথ্য সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেনি। তবে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত এই বিপুল সংখ্যক ফোন কলের তুলনায় পরীক্ষার সংখ্যা খুবই কম (প্রায় চার লক্ষ)। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ চিহ্নিতকরণের শুরুর দিকে অর্থাৎ ২১ জানুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত যে পরিমাণ ফোন কল আসে তার তুলনায় পরীক্ষার হার সবচেয়ে কম। অর্থাঃ প্রতিদিন গড়ে ৬৩৯ টি কলের বিপরীতে ১২টি করে পরীক্ষা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে পরীক্ষার পরিসর বৃদ্ধি করা হলেও ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগের সংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার সংখ্যা এখনও অনেক কম।

সারণী: সময় অনুসারে নমুনা পরীক্ষার চিত্র (১১ জুন পর্যন্ত)

সময়কাল	পরীক্ষাগারের সংখ্যা	মোট নমুনা পরীক্ষা	দিন প্রতি পরীক্ষা	দিন প্রতি/ল্যাব প্রতি পরীক্ষা	কোভিড বিষয়ক ফোন কলের অনুপাতে পরীক্ষা
২৫ মার্চ পর্যন্ত	১	৭৬৪	২৩	২৩	৬৩৯:১
২৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	১৭	১৪৪৭৩	১৭০	৩৮	১৪৩:১
১৫- ৩০ এপ্রিল	৩০	৬৪২৭১	৬৩৬	১১১	২৫:১
১-১৫ মে	৪১	১৬০১১৭	১৩৮০	১৫৬	১৮:১
১৫-৩১ মে	৫২	৩০৯১৭৭	২৫৩৪	১৭৯	২২:১
১-১১ জুন	৫৬	১৪৮৪০২	১৩৪৯১	২৪১	১৩:১

তবে গণমাধ্যমে জানা যায় বিপুল সংখ্যক সন্দেহভাজন মানুষ বারবার চেষ্টা করেও পরীক্ষাগারগুলোর সংগে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া সংক্রমণের প্রথম দিকে আইইডিসিআর অনেক রোগীর লক্ষণ শুনে এবং বিদেশ থেকে এসেছে এমন কারও সংস্পর্শে

[৬৯]বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[৭০]The new age, 18 April, 2020, বিস্তারিত দেখুন:https://epaper.newagebd.net/18-04-2020/1

[৭১]দেশ রূপান্তর, ৮ মে, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/home/printnews/216635/2020-05-08

[৭২]ডয়েচে ভেলে, ২০ মার্চ ২০২০, প্রাগুক্ত

এসেছে কিনা তা শুনে ফোন কলের মাধ্যমে বাছাই করে অনেক সন্দেহভাজন রোগীকে ফিরিয়ে দিয়েছে।[৭৩] যদিও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অনেকের কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে। ফলে পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বিপুল সংখ্যক আক্রান্ত ব্যক্তি কমিউনিটিতে সংক্রমণ বিস্তার করে গেছে এবং যা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া বর্তমানেও হটলাইনে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হওয়া বিপুল সংখ্যক মানুষকে সরাসরি বিভিন্ন পরীক্ষাগারে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। অনেক পরীক্ষাগারের সামনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রাত জেগে রাস্তায় শুয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে।[৭৪]

জনসংখ্যার বিপরীতে ১১ জুন ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র ৪৫৭৩৩২ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। জনসংখ্যা অনুপাতে পরীক্ষার হারের দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। এবং বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯ তম।[৭৫]

সারণী: দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে পরীক্ষার হার (১৩ জুন পর্যন্ত)[৭৬]

দেশ	জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হার (%)
মালদ্বীপ	৫.৩৬
ভুটান	২.৬৬
নেপাল	১.০১
শ্রীলংকা	০.৩৮
ভারত	০.৩৯
পাকিস্তান	০.৩৭
বাংলাদেশ	০.২৯
আফগানিস্তান	০.১৪
আরব আমিরাত	২৬.৫৭
ডেনমার্ক	১৩.৩৩
স্পেন	৯.৫৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭.১৯

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায় ২৯ শতাংশ হাসপাতাল তাদের চাহিদা বা প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক বা তার কম সংখ্যক পরীক্ষা করাতে সক্ষম হয়।

[৭৩]বিবিসি, বাংলা, ৩১ মার্চ ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-52095172
[৭৪]দেশ রূপান্তর, ১৯ মে, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/first-page/2020/05/19/219141
[৭৫]Worldometer, ১২ জুন, ২০২০ তারিখে https://www.worldometers.info/coronavirus/হতে সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ
[৭৬] Worldometer, প্রাগুক্ত

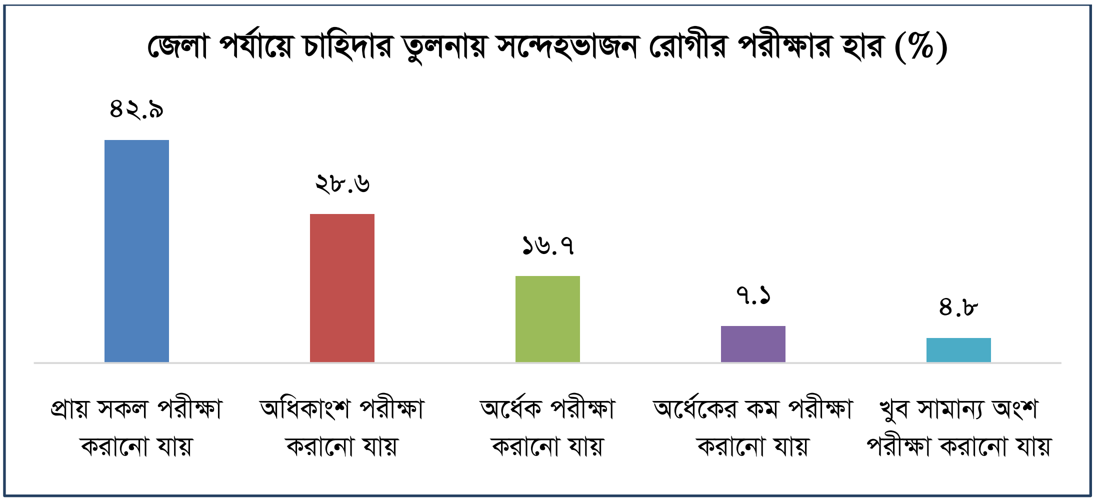

৩.৫ সক্ষমতা অনুযায়ী পরীক্ষা করতে না পারা: বাংলাদেশে বিলম্বে হলেও সংক্রমণের বৃদ্ধির সাথে সাথে পরীক্ষা কার্যক্রমও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তবে পরীক্ষার সক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হলেও এই তা ধারাবাহিকভাবে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

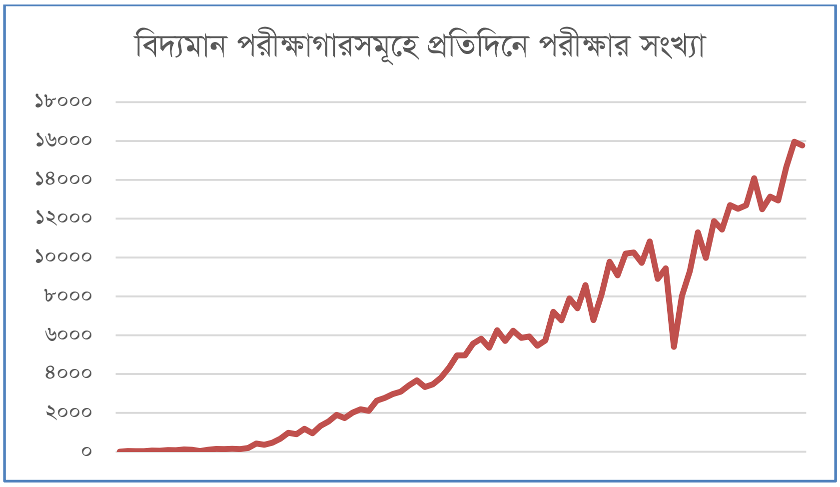

পরীক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা অনুযায়ী পরীক্ষা করতে না পারার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে-

৩.৫.১ নমুনা পরীক্ষায় দায়িত্বহীনতা ও সমন্বয়ের অভাব: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আইইডিসিআর এর মধ্যেকার সমন্বয়হীনতার কারণে পরীক্ষা কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। আইইডিসিআর সংক্রমণ চিহ্নিতকরণের শুরুর প্রথম দিকে পরীক্ষার কর্তৃত্ব নিজেদের কাছে রাখে এবং স্বল্প সংখ্যক পরীক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকে। পরবর্তীতে সংক্রমণ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়লে আইইডিসিআর পরীক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাছে রাখতে অপরাগতা প্রকাশ করে। এবং হঠাৎ করে নমুনা সংগ্রহ করতে মাঠে থাকা **১৭টি** টিমকে কাজ বন্ধ করে মাঠ থেকে তুলে আনা হয় এবং তাদের কাছে জমা থাকা নমুনা পরীক্ষাও বন্ধ করে দেয়। পরীক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্বের এই পরিবর্তন বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জাতীয় টেকনিক্যাল উপদেষ্টা কমিটিকে অবহিত করেনি। জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি শুরুর আগে আইইডিসিআরের এই পদ্ধতি বন্ধ করা উচিত হয়নি।[৭৭]পরীক্ষাগারগুলোতে নমুনা বন্টনের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। দেখা যায় যে, কোনো কোনো পরীক্ষাগারে সক্ষমতার চাইতে দ্বিগুণ নমুনা আসছে আবার কোনো কোনো পরীক্ষাগারে সক্ষমতার চাইতে অনেক কম নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।[৭৮]

৩.৫.২ সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু পরীক্ষাগারের পূর্ণ সুবিধাব্যবহার না করা: আইইডিসিআরের একক কর্তৃত্বের কারণে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু পরীক্ষাগার তাদের পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর’বি) এর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরীক্ষার জন্য আটটি পিসিআর মেশিন এবং নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী থাকায় তারা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার শুরুতেই আইইডিসিআরের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও তারা এই আইসিডিডিআর,বি-এর এই সুবিধা কাজে লাগাতে অনীহা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তাদের অনুমোদন দেয়া হলেও

[৭৭]দেশ রূপান্তর, ৮ মে, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/home/printnews/216635/2020-05-08
[78]দেশ রূপান্তর, ১৮ মে, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/home/printnews/218958/2020-05-18

তাদের প্রথমে মাত্র ১০০ টি কিট দেয়া হয়।[৭৯] বাণিজ্যিকভাবে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন ১৩টি বেসরকারি পরীক্ষাগার ব্যতিত ঢাকার মধ্যে মাত্র দুইটি পরীক্ষাগারে মানুষ সরাসরি গিয়ে নমুনা দিতে পারছে। বাকী পরীক্ষাগারগুলোতে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত নমুনা পাঠানো হয়।[৮০] আইসিডিডিআর'বি প্রতিদিন ৭০০ টেস্ট করতে সক্ষম।[৮১] সেই হিসেবে ৩০ মার্চ তারিখে পরীক্ষার অনুমোদন পাওয়ার পর আইসিডিডিআর,বি দুইমাসে ৪২ হাজার নমুনা পরীক্ষা করতে সক্ষম হলেও ৩১ মে, ২০২০ পর্যন্ত তাদেরকে দিয়ে মাত্র ১৫৬৭৮ টি পরীক্ষা করানো হয়।[৮২]একইভাবে ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপিং সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ ইনিশিয়েটিভস (আইডেশি) এর প্রতিদিনের পরীক্ষা করার সক্ষমতা ৪৫০টি[৮৩] অর্থাৎ দুইমাসে তারা প্রায় ২৭ হাজার পরীক্ষা করতে সক্ষম হলেও তাদের দিয়ে মাত্র ৬১২৮টি পরীক্ষা করানো হয়েছে।

৩.৫.৩ টেকনোলজিস্ট সংকট:বিশেষজ্ঞমতে একটি পিসিআর মেশিন চব্বিশ ঘন্টা চালাতে ৩০ জন টেকনোলজিস্ট প্রয়োজন।[৮৪]কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট এর সংকট রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ হাজার বেকার টেকনোলজিস্ট থাকলেও[৮৫] আদালতে একটি মামলা চলমান থাকার কারণে দীর্ঘ এগারো বছর ধরে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।[৮৬] বাংলাদেশে প্রায় ৩০০০ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পদের বিপরীতে প্রায় ২০০০ টেকনোলজিস্ট কর্মরত রয়েছে।[৮৭] বাংলাদেশ সরকার নার্স ও চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করলেও সংক্রমণ শুরুর তিন মাসেও টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হয়নি। যদিও বর্তমানে টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়েছে। টেকনোলজিস্ট সংকটের কারণে বেশ কিছু পরীক্ষাগারে এক বা দুই শিফটের বেশি পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার মাঠ পর্যায় থেকে নমুনা সংগ্রহও করা যাচ্ছে না।

৩.৫.৪ প্রশিক্ষণ সংকট: বিশেষজ্ঞমতে মাঠ পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে। যাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে তাদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি আছে। তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। অনলাইনে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেটা যথেষ্ট নয়। ফলে পর্যাপ্ত নমুনা সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। অনেকক্ষেত্রে সঠিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ না করায় কিছু নমুনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার পিসিআর পদ্ধতি বেশ জটিল এবং এই পরীক্ষা করার মতো দক্ষ টেকনিশিয়ানেরও সংকট রয়েছে। খুলনা মেডিকেল কলেজে করোনাভাইরাস পরীক্ষা করার জনবল আছে ১৩ জন। এর মধ্যে একজন টেকনোলজিস্ট ছাড়া আর কারোরই এই পরীক্ষা করার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।একজন ভাইরোলজিস্ট বলেন, করোনা পরীক্ষার জন্য অনলাইনে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা হাস্যকর। হাতেকলমে প্রশিক্ষণ ছাড়া কারও পক্ষে এ ধরনের পরীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।[৮৮] বিশেষজ্ঞ মতে ত্রুটিপূর্ণভাবে নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং প্রক্রিয়াকরণের ফলে অনেক নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভুল প্রতিবেদন আসতে পারে যা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত 'ফলস্ নেগেটিভ' হতে পারে (আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষায় তা ধরা না পড়া)।

৩.৫.৫ পরীক্ষাগার কার্যকর না থাকা:বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বর্তমানে ৬০টি হলেও মে মাসের ১৫ তারিখ হতে প্রতিদিন গড়ে চার থেকে পাঁচটি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা করা যায় নি। এর মধ্যে মে মাসের ২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ১১টি এবং ১৫ এবং ২৯ তারিখে ৮টি করে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষা করা যায় নি।[৮৯] এক্ষেত্রে মুগদা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ, শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কলেজ, জামালপুর ইত্যাদি পরীক্ষাগারগুলোতে পরীক্ষা না করতে পারার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রটিতে করোনা সংক্রমণ পরীক্ষা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[৯০] বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বাড়লেও এর সক্ষমতা ধরে রাখার বিষয়ে পরিকল্পনার ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

৩.৫.৬ নিম্নমানের মেশিন ক্রয়: পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ করতে সরকারিভাবে ৩১টি আরটি পিসিআর মেশিন ক্রয় করা হয়। করোনা সংকটকালে বিশ্বব্যাপি চাহিদার কারণে সরবরাহকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সালের পুরানো মডেলের পিসিআর মেশিন সরবরাহ

[৭৯]যুগান্তর, ১ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/294533/
[৮০]দেশ রূপান্তর, ৪ মে, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.deshrupantor.com/first-page/2020/05/04/215593
[৮১]প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1650534/
[৮২]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ৩১ মে ২০২০
[৮৩]প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০২০, প্রাগুক্ত
[৮৪]যুগান্তর, ১ এপ্রিল ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/294533/
[৮৫] The new age, 18 April, 2020
[৮৬] Dhaka tribune, 27 April, 2020
[৮৭]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য বুলেটিন, ২০১৮, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) এবং মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (রেডিওগ্রাফার) এর সমষ্টি
[৮৮]প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1650534/
[৮৯]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ
[৯০]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ৩ জুন, ২০২০

করে। মেশিনের ক্রুটির কারণে কয়েকটি হাসপাতাল এই মেশিন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কয়েকটি পরীক্ষাগারে বারবার পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার এটা একটি কারণ।[৯১]

৩.৬ আক্রান্ত ব্যক্তির দুর্ভোগ:

উল্লিখিত কারণে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরীক্ষার ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরীক্ষাগারগুলোতে সংগৃহিত নমুনা জমা হয়ে যাচ্ছে, নতুন নমুনা সংগ্রহ করতে বিলম্ব হচ্ছে এবং যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে নানা ধরনের দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।

"ঢাকায় একটি পরিবারের তিন সদস্যের কয়েক দিন ধরে জ্বর, গলাব্যথা। পরিবারের সদস্যরা একাধিকবার সরকারের আইইডিসিআর এর দেওয়া ফোনে যোগাযোগ করেছেন। নমুনা সংগ্রহের জন্য যাওয়ার কথা বললেও আইইডিসিআরের পক্ষে কেউ যাননি।"

"মিরপুরের একটি পরিবারের একজন নারী সদস্য করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা যান। ওই পরিবারের একাধিক সদস্য এখনো জ্বরে ভুগছেন। আইইডিসিআরের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেও কোনো পরীক্ষা করাতে পারেননি।"

"রাজধানীর হাতিরপুলের একটি বাসা থেকে ১৪ এপ্রিল এক ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করেন আইইডিসিআরের টেকনোলজিস্টরা। নমুনা সংগ্রহের পর তাঁকে একটি আইডি নম্বর দেওয়া হয় এবং বলা হয়, দুয়েকদিন মধ্যে ফলাফল জানানো হবে। ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে ফলাফল জানায়নি আইইডিসিআর।"[৯২]

উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনাই এপ্রিল মাসে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো বেশি লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে রয়েছে-

- নির্ধারিত হটলাইনগুলোতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া
- টেলিফোনে সম্ভাব্য আক্রান্ত ব্যক্তি কোনো প্রবাসীর সংস্পর্শে এসেছে কিনা বা বিদেশে যাওয়ার ইতিহাস আছে কিনা তার ভিত্তিতে নমুনা পরীক্ষার জন্য বাছাই করা
- নমুনা সংগ্রহ করা হবে জানানো হলেও পরবর্তীতে নমুনা সংগ্রহ না করা
- পরীক্ষাগারে সরাসরি নমুনা সংগ্রহের ঘোষণা দিয়ে পরবর্তীতে নমুনা না নেয়া
- কোথায় সরাসরি নমুনা গ্রহণ করা হয় এ বিষয়ে তথ্যর ঘাটতি; এর ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি নির্ধারিত কোনো ল্যাবে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ফিরে আসা।
- নমুনা নিতে অনেক বিলম্ব করা; কোথাও কোথাও সাত থেকে ১০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়
- নমুনা দেয়ার জন্য একাধিকবার কেন্দ্রে যেতে বাধ্য করা
- নমুনা নেয়ার জন্য গাদাগাদি করে রোগী বসিয়ে রাখা
- নমুনা প্রদানের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষাগারের সামনে রাস্তায় সারারাত অপেক্ষা
- সরাসরি নমুনা নেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখার ফলে নেগেটিভ রোগীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা
- দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাড়িয়ে থাকা
- প্রতিবেদন দিতে দীর্ঘ সময় বিলম্ব
- ভুল প্রতিবেদন প্রদান
- পরীক্ষা করতে না পারার কারণে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে না পারা

এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায় উক্ত হাসপাতালের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষার প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার গড় সময় ৩.৫ দিন। কোথাও কোথাও প্রতিবেদন পেতে সর্বোচ্চ ৮ দিন পর্যন্ত সময় লাগে।

[৯১] দৈনিক সমকাল, ১৭ মে, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/bangladesh/article/200523292/
[৯২] প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1653422/

সারণী: করোনা ভাইরাস পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার সময়

সর্বনিম্ন সময়	সর্বোচ্চ সময়	গড় সময়
১	৮	৩.৫

৩.৭নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি: চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) পরীক্ষগারে নমুনা পরীক্ষার জন্য রোগীর কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ১০০০ টাকা গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া যায়।[৯৩]এছাড়া নির্ধারিত পরীক্ষাগারগুলোতে দীর্ঘ লাইনের কারণে এবং দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অনেক আক্রান্ত ব্যক্তি দালালের কাছ থেকে এক থেকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে সিরিয়াল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালসমূহে বিভিন্ন ফি বা চার্জের নামে সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া পরীক্ষার ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত এক থেকে দেড় হাজার টাকা নিচ্ছে। এছাড়া বিদেশ যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে করোনা নেগেটিভ সনদ সংগ্রহ করতে অনেকে বাধ্য হচ্ছে।[৯৪]

৩.৮ উপসংহার: বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরুর পূর্ব থেকে এবং বিভিন্ন এলাকায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লেও পরীক্ষার ক্ষেত্রে একক কর্তৃত্ব বজায় রাখার কারণে দীর্ঘ সময় মাত্র একটি পরীক্ষাগার দিয়ে সীমিত পর্যায়ে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে পরীক্ষা কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারিত করা হলেও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে এবং কোথাও কোথাও জনবল সংকটের কারণে পরীক্ষাগারগুলোর সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও পরীক্ষার আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। পরীক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা আক্রান্ত মানুষের ব্যাপক দুর্ভোগের কারণ এবং দুর্ভোগের শিকার মানুষকে দুর্নীতির শিকার হতে বাধ্য করছে।

[৯৩] The Daily star, 6 April, 2020
[৯৪]দৈনিক সমকাল, ৮ জুন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/bangladesh/article/200625948

চতুর্থ অধ্যায়

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১৪ শতাংশের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং অক্সিজেন সহায়তার প্রয়োজন হয় এবং পাঁচ শতাংশ রোগীর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়।[৯৫]বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়াদান পরিকল্পনায় ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট বা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ দেশে সংক্রমণ শুরুর পূর্বেই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের নির্ধারিত হাসপাতালসমূহকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রদানে সক্ষম করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও এর জন্য নির্ধারিত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, গুরুতর রোগীদের জন্য রেফারেল প্রক্রিয়া প্রস্তুত, সকল হাসপাতালে অন্যান্য সেবা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার জন্য ট্রায়াজ ও স্ক্রিনিং ব্যবস্থা তৈরি, এবং আক্রান্ত ব্যক্তির স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা। এছাড়া যখন কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার লাভ করবে তখন দেশের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে এই চিকিৎসা প্রদানের সক্ষমতা তৈরি করা ইত্যাদি।

৪.১ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ-নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দাবী অনুযায়ী বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।[৯৬] অপরদিকে ৬ মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ জানান যে সারা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ১০ হাজার শয্যার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এক্ষেত্রে সারা দেশে প্রতিটি হাসপাতালে ৫টি করে আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে, এমনি কি উপজেলা পর্যায়েও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।[৯৭] ২৯ মার্চ ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানান যে করোনা আক্রান্ত সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশে ৫০০ এর কাছাকাছি ভেন্টিলেটর আছে আছে এবং আরও ৩৫০টি আমদানী করা হচ্ছে। এত সংখ্যক ভেন্টিলেটর অনেক উন্নত দেশেও থাকে না।[৯৮] বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসায় ব্যাপক প্রস্তুতির কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

৪.২ করোনায় আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রস্তুতির ঘাটতি: করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপক প্রস্তুতির কথা বলা হলেও গবেষণায় অন্তভর্ভূক্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাত্র ২৭ শতাংশ হাসপাতাল মার্চ মাসের পূর্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার প্রস্তুতি শুরু করেছে।

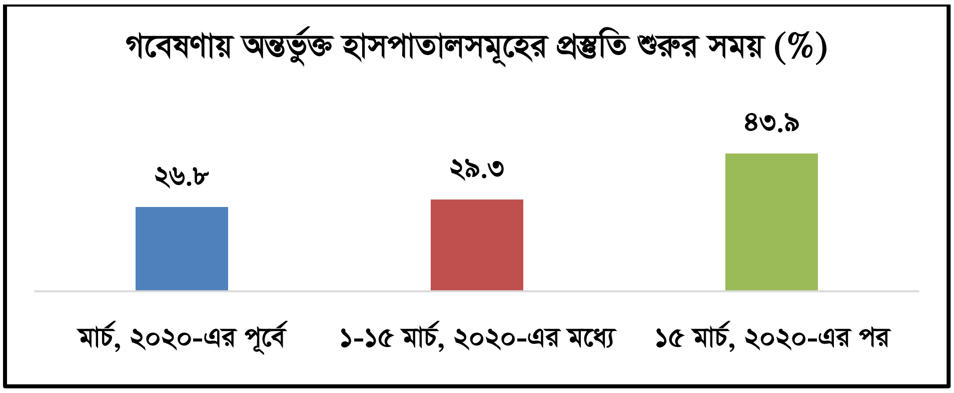

জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর শতকরা ৪৪ শতাংশ হাসপাতালে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বেই বাংলাদেশের কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। অধিকাংশ হাসপাতালে শুধুমাত্র আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অসুস্থতা গুরুতর হয়ে উঠলে শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চীন, ইতালিসহ যেসব দেশে বেশি রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, সেখানে নিউমোনিয়া, ফুসফুসের জটিলতার কারণেই বেশিরভাগ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার এক পর্যায়ে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের সুবিধার ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। সিলেটের মতো একটি বিভাগীয় শহরে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের অভাবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত একজন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়।[৯৯] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক করোনা ভাইরাস মোকাবেলার

---

[৯৫]WHO, Clinical Care for Severe Acute Respiratory Infection,WHO/2019-nCoV/SARI_toolkit/2020.1WHO/2019-nCoV/SARI_toolkit/2020.1

[৯৬]বাংলা ট্রিবিউন, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/others/news/608651/

[৯৭]বিবিসি বাংলা, ৬ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-51772994

[৯৮]দ্য ডেইলি স্টার, ২৯ মার্চ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/bangla/141559

[৯৯]বাংলা ট্রিবিউন, ৯ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/country/news/617783/

ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতা পর্যালোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিত ঘাটতি ও ঝুঁকিসমূহ অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলা হলেও[১০০] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর মধ্যে ১৯শতাংশ হাসপাতালে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে এবং প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কি কি প্রয়োজন তা যাচাই না করেই প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে।

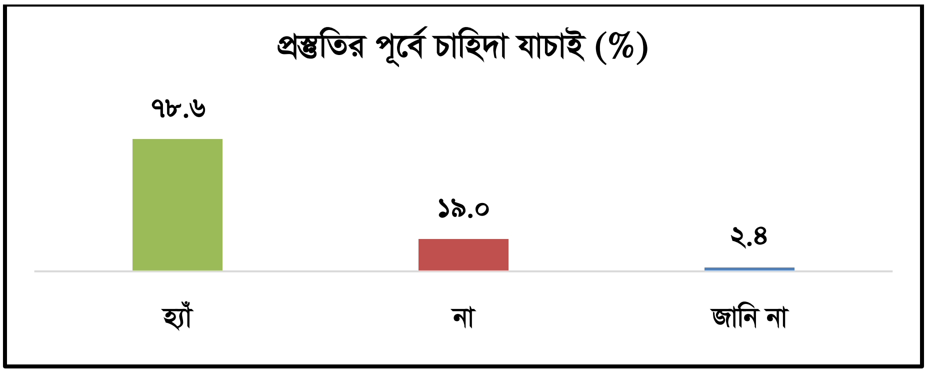

৪.২.১ আইসিইউ সংকট: পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে বিশেষজ্ঞ মতে বাংলাদেশে শয্যা অনুপাতে প্রায় পাঁচ হাজার আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর থাকার কথা থাকলেও ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালসমূহে আইসিইউ ছিল মাত্র ৪৩২টি (ঢাকায় ৩২২, ঢাকার বাইরে ১১০) আর বেসরকারি হাসপাতালে ছিল ৭৩৭টি (ঢাকা মহানগরীতে ৪৯৪, ঢাকা জেলায় ২৬৭, অন্যান্য জেলায় ২৪৩)।[১০১] ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের ৪৭টি জেলায় কোনো আইসিইউ সুবিধা ছিল না।[১০২] দেশে সর্বমোট কতগুলো আইসিইউ আছে সরকারের কাছে উচ্চ আদালতের প্রশ্নের জবাবে জানানো হয় ১০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারি আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৭৩৩টি।[১০৩]

সারণী: বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে আইসিইউ সংখ্যা[১০৪]

দেশ	প্রতি লাখ জনসংখ্যার জন্য আইসিইউ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৪.৭
জার্মানী	২৯.২
ইতালি	১২.৫
ফ্রান্স	১১.৬
সাউথ কোরিয়া	১০.৬
ভারত	২.৩
শ্রীলঙ্কা	২.৩
নেপাল	২.৮
পাকিস্তান	১.৫
মিয়ানমার	১.১
বাংলাদেশ	০.৭

বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সকল সময় উন্নত বিশ্বের সাথে বাংলাদেশকে তুলনা করলেও প্রতি লক্ষ জনসংখ্যার তুলনায় আইসিইউ শয্যার সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য ২৫ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে মোট আইসিইউ ছিল মাত্র ২৯টি,[১০৫] ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল মাত্র ১৪২টি এবং[১০৬] ১ জুন পর্যন্ত ছিল মাত্র ৩৯৯টি।[১০৭] বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে

[১০০] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা,National capacities review tool for a novel coronavirus (nCoV), ১০ জানুয়ারি ২০২০, WHO/2019-nCoV/Readiness/v2020.1
[১০১] বিবিসি, বাংলা, ২৫ জানুয়ারি, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-52018765
[১০২] দৈনিক যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/302913/
[১০৩] দ্য ডেইলি স্টার, ১০ জুন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/bangla/-155689
[১০৪] ফোর্বস ম্যাগাজিন, ১২ মার্চ, ২০২০ এবং দ্য ডেইলি স্টার, ৪ এপ্রিল ২০২০ তারিখ এর সংবাদ একসাথে সংকলন করা হয়েছে বিস্তারিত দেখুন: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/03/12/the-countries-with-the-most-critical-care-beds-per-capita-infographic/#362f34bd7f86এবংhttps://www.thedailystar.net/bangla/-142420
[১০৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ২৪ মার্চ, ২০২০
[১০৬] দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০২০, https://epaper.prothomalo.com//printtextviews.php?id=45720&boxid=801643832&type=img
[১০৭] দৈনিক প্রথম আলো, ৪ জুন, ২০২০, https://epaper.prothomalo.com//printtextviews.php?id=47359&boxid=806798288&type=img

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিদিন এক হাজার মানুষের আইসিইউ শয্যার প্রয়োজন হয়। সেখানে করোনা রোগীসহ বিপুল সংখ্যক সংকটাপন্ন রোগীর জন্য আইসিইউ এর অপ্রতুলতা বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে এবং ইতোমধ্যে অনেকে মৃত্যু বরণ করছে।[১০৮] ঢাকা শহরের বাইরে আইসিইউ সংকট আরও অনেক বেশি। চট্টগ্রামেদুই কোটি মানুষের জন্য আইসোলেশন শয্যা ৩৩০ টি এবং আইসিইউ মাত্র ২৬টি। ৬ জুন পর্যন্ত চট্টগ্রামে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার।[১০৯]

বর্তমানে বাংলাদেশে আইসিইউ এর চাহিদা

গত ১৪ দিনে প্রতি দিন গড় নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা		১৩,৭৫২ জন
গত ১৪ দিনে গড় আক্রান্তের সংখ্যা		২৮৮৩ জন (২১%)
প্রতিদিন ভেন্টিলেশনসহ আইসিইউ প্রয়োজন (আক্রান্তের ৫%)	২৮৮৩x৫÷১০০	১৪৪ জন
করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার জন্য অপেক্ষার গড় সময়	৩ দিন	
ফলে প্রতিদিন ভেন্টিলেশনসহ আইসিইউ প্রকৃত প্রয়োজন ৩ গুন	১৪৪x৩	৪৩২ জন
গড়ে একজন রোগীর ভেন্টিলেশনসহ আইসিইউ প্রয়োজন	৭ দিন	
ফলে বর্তমানে দেশে আইসিইউ'র প্রকৃত চাহিদা	**৪৩২x৭**	**৩০২৪ টি**

৪.২.২ ভেন্টিলেশন সংকট: করোনাভাইরাসে সংক্রমিত সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র বা ভেন্টিলেটর ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের তথ্যমতে ৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ১৭৬৯টি ভেন্টিলেটর ছিল অর্থাৎ প্রতি ৯৩ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করে ভেন্টিলেটর।[১১০]২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত করোনার চিকিৎসায় এ সুবিধা শুধু রাজধানীর নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতেই ছিল। ঢাকায় পাঁচটি হাসপাতালে মোট ২৯টি ভেন্টিলেশন সুবিধা ছিল। ঢাকার বাইরে ৬৩ জেলায় করোনার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালসমূহের আইসোলেশন ইউনিটে কোনো ধরনের ভেন্টিলেশন সুবিধা ছিল না।[১১১] তবে স্বাস্থ্য অধিদফতরের হাসপাতাল শাখার তথ্য অনুযায়ী রাজধানী ও এর বাইরের বিভিন্ন জেলার ৩৩টি হাসপাতালে আইসিইউ ভেন্টিলেটর ছিল ৩০০টি। নতুন করে সরবরাহ করা হচ্ছে আরও ১৩৪টি, মেরামতযোগ্য ৪৩টি। এ ছাড়া বিতরণযোগ্য আইসিইউ ভেন্টিলেটর রয়েছে ১৮৯টি।[১১২]ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডনের একটি গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, ৩০ জুনের মধ্যে উচ্চ চাপযুক্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ শয্যার প্রয়োজন হবে প্রায় ২০ হাজার, এবং ভেন্টিলেটরসহ আইসিইউ শয্যার প্রয়োজন হবে ৫২৫৪ টি। [১১৩] ভেন্টিলেশন সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল অক্সিজেন ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরী হলেও বাংলাদেশে মাত্র ২১ টি হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। এবং ৩৯টি হাসপাতালে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।[১১৪] বেশ কয়েকটি হাসপাতালে আইসিইউ ও ভেন্টিলেশন সাপোর্ট থাকলেও সেন্ট্রাল অক্সিজেন সরবরাহ না থাকার কারণে তা ব্যবস্থাপনা দুরূহ হয়ে উঠছে।

৪.২.৩ যন্ত্রপাতির ঘাটতি:এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহেও ঢাকা ও ঢাকার বাইরে করোনার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোর মধ্যে ১৭টি হাসপাতালে সেবার ক্ষেত্রেকিছু ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এসকল হাসপাতালে শ্বাসকষ্টসহ করোনায় আক্রান্ত জটিল রোগীদের চিকিৎসায় ১৮৩টি ভেন্টিলেটর দেয়া হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালগুলোয় আইসিইউ শয্যা ছিল মাত্র ১৩৩টি। ভেন্টিলেটর মেশিন স্থাপন করা হলেও আইসিইউ শয্যা ঘাটতি ছিল ৫০টি। একইভাবে পেশেন্ট মনিটর ঘাটতি রয়েছে ৯০টি, পালস অক্সিমিটার ৩৪টি, এবিজি মেশিন উইথ গ্লুকোজ অ্যান্ড ল্যাকটেট ঘাটতি ১৭টি, ডিফেব্রিলেটর এক্সটারনালের ঘাটতি ২৮টি। এসব ভেন্টিলেটর কার্যকর করতে ১২ চ্যানেলের ইসিজি মেশিন প্রয়োজন ৩০টি, পোর্টেবল ভেন্টিলেটর দরকার ৩৪টি। আইসিইউর তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে ৫ টনের এসি দরকার ৩০টি, ডিহিউমিডিফায়ার ২৫ এল দরকার ৩০টি এবং অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার দরকার ৮৫টি।[১১৫]

[১০৮]দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ittefaq.com.bd/covid19-update/148227/
[১০৯]দৈনিক সমকাল, ৬ জুন, ২০২০, https://samakal.com/bangladesh/article/200625691/
[১১০]দ্য ডেইলি স্টার, ৭ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/bangla/143062
[১১১]বণিকবার্তা, ২৫ মার্চ ২০২০, প্রাগুক্ত
[১১২]দৈনিক যুগান্তর, ২২ এপ্রিল, ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/300398/
[১১৩]
[১১৪]দ্য ডেইলি স্টার, ১১ জুন ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/frontpage/news/-1912405
[১১৫] দৈনিক যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/298560/

৪.২.৪ জনবল সংকট: করোনার জন্য নির্ধারিত হসপাতালগুলোর মধ্যে ৩টি হাসপাতালে ৫৫টি আইসিইউ শয্যা থাকলেও এসব আইসিইউ পরিচালনা বা রোগীদের পরিচর্যার জন্যপ্রশিক্ষিত চিকিৎসক বা নার্স নেই।করোনা ডেডিকেটেট হাসপাতালগুলোতে যথেষ্ট চিকিৎসক সংযুক্ত করা হয়নি। যাদের সংযুক্ত করা হয়েছে তারা সবাই রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত নন। অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীও অপ্রতুল। রাজধানীর কুর্মিটোলা ও কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল ছাড়া অন্য ছয়টি হাসপাতালে ক্লিনার, আয়া বা সহায়তাকারী লোকবল সংকট রয়েছে।[১১৬]

৪.৩ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জ: গবেষণার অন্তর্ভূক্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ উঠে আসে।

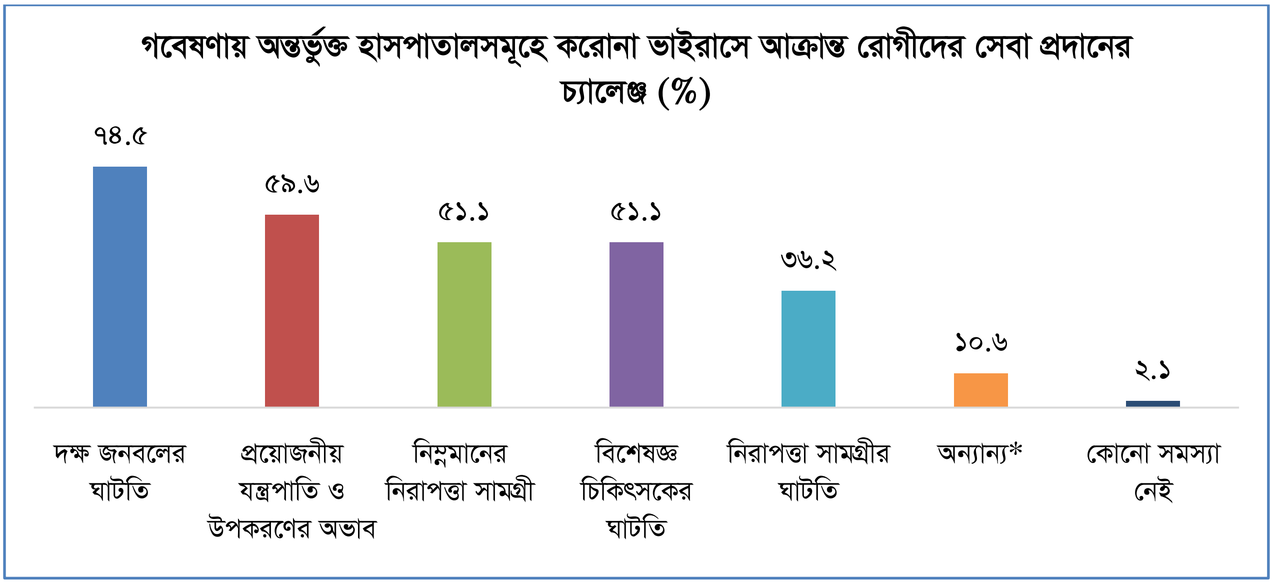

**অন্যান্যর মধ্যে রয়েছে হাসপাতালের পানির সংকট, নিরাপত্তার সমস্যা, নারীদের জন্য পৃথক আইসোলেশন ব্যবস্থা না থাকা, হাসপাতালে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে জায়গার অভাবে রোগীদের মধ্যেকার নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হওয়া ইত্যাদি।*

বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার যে ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে তা করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হাসপাতালের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে দক্ষ জনবলের ঘাটতি (৭৫%), প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি (৫৯.৬%) এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি (৫১.১%)। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা (হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, নিউরো, কিডনি, শ্বাসজনীত জটিলতা ইত্যাদি) থাকতে পারে, ফলে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালসমূহে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সংযুক্ত না করার ফলে এই ধরনের চিকিৎসা প্রদান করা বর্তমানে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। আর করোনাকালীন সময়ে নতুন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা এবং সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতির কারণে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে চিকিৎসা দেওয়া থেকে বিরত থাকছে।

৪.৪ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রণয়ন, সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণে ঘাটতি: করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সর্বমোট ৩৩টি গাইডলাইন প্রণয়ন[১১৭] এবং সময় সময় হালনাগাদ করে তা বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেও স্বাস্থ্যকর্মীদের এবিষয়ক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে।

[১১৬] দৈনিক যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল ২০২০, প্রাগুক্ত,

[১১৭] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য বুলেটিন, ১১ জুন ২০২০

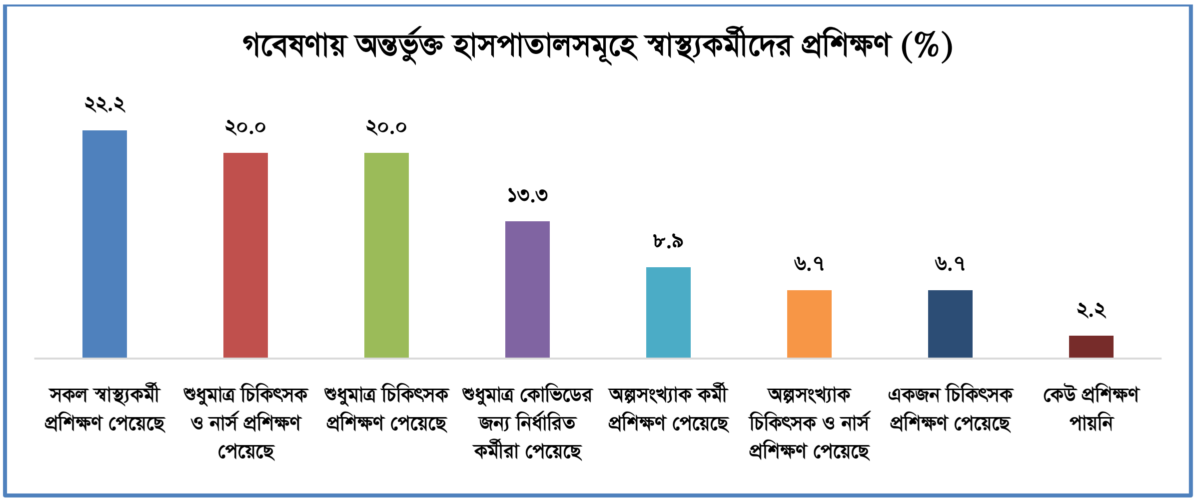

এই গবেষণায় অন্তভর্ভুক্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর মধ্যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ পেয়েছে এমন হাসপাতালের সংখ্যা খুব কম (২২%)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। কোথাও কোথাও দেখা গেছে যে একজন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাকী সবাইকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। তবে এখনও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কেউ প্রশিক্ষণ পায়নি বা মাত্র একজন-দুইজন প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রশিক্ষণের এই ঘাটতির কারণে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা লক্ষ করা গেছে।

৪.৫ করোনার প্রভাবে অন্যান্য চিকিৎসা সেবায় অব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়হীনতা: করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবা প্রদানের কারণে অন্যান্য সাধারণ চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রেও নানা ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যাচ্ছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর মধ্যে ৫৩.৩ শতাংশ হাসপাতালে করোনা আক্রান্তের সেবার কারণে সাধারণ চিকিৎসা সেবায় ব্যাঘাত ঘটছে। সাধারণ সেবায় ব্যাঘাত ঘটার অন্যতম কারণ হচ্ছে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা (৭১%)।

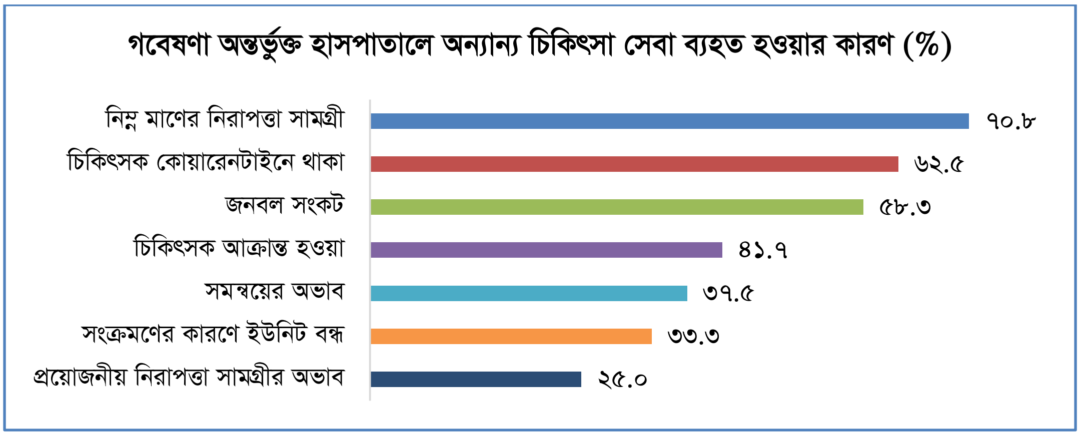

নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রীর কারণে অনেক স্বাস্থ্য কর্মী আক্রান্ত হচ্ছে, আবার অনেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সেবা দেওয়া থেকে বিরত থাকছে। এছাড়া চিকিৎসকদের কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া বা আক্রান্ত হওয়ার কারণেও সাধারণ সেবা ব্যহত হচ্ছে। কিছু চিকিৎসা কর্মীকে শুধুমাত্র করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত করা এবং স্বাস্থকর্মী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে সৃষ্ট জনবল সংকটের কারণেও সাধারণ চিকিৎসা সেবা ব্যহত হচ্ছে।

৪.৮ করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতি:করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহ থেকে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠে এসেছে তা হচ্ছে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ (৫৯ শতাংশ হাসপাতালের ক্ষেত্রে)।

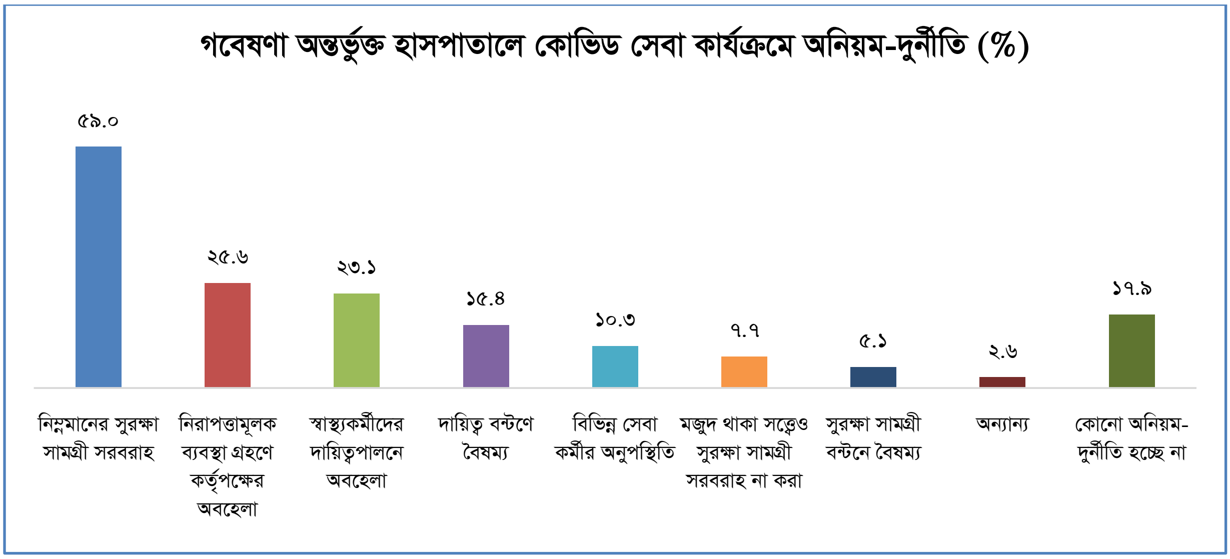

৪.৭ আক্রান্ত রোগীর দুর্ভোগ:করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার জন্যনির্ধারিত হাসপাতালসমূহের চিকিৎসায় প্রস্তুতি ও সক্ষমতার ঘাটতি, এবং অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে রোগীদের নানা ধরনের দুর্ভোগ লক্ষ করা গেছে। যে দুর্ভোগগুলো সামনে এসছে-

- করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা না পাওয়া
- হাসপাতালে ভর্তির পর রোগীদের কাছে চিকিৎসক-নার্সরা না গিয়ে ইন্টারকমে ফোন করে খোঁজখবর নেওয়া; দরজার বাইরে খাবারের প্যাকেট রেখে তাদের খেয়ে নিতে বলা
- রোগীর কক্ষে পরিষ্কার করার জন্যও কেউ না আসা
- নারী ও পুরষদের একই আইসোলেশন কক্ষে রাখা
- যথাসময়ে অক্সিজেন সরবরাহ না করা, রোগীর এটেনডেন্টদের দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ বহন করানো
- করোনা সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি রোগী মারা গেলে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা
- রোগী মারা গেলেও মৃতদেহ দীর্ঘ সময় না সরানো

৪.৮ উপসংহার:বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মোকাবিলার জন্য জাতীয়পরিকল্পনা বিলম্বে প্রণয়ন, পরিকল্পনা অনুসারে সংক্রমণ শুরুর পূর্বেই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে ঘাটতি যাচাইপূর্বক যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে বিলম্ব, করোনা আক্রান্তের চিকিৎসার জন্যনির্ধারিত হাসপাতালসমূহের চিকিৎসায় প্রস্তুতি ও সক্ষমতার ঘাটতি, এবং অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ সাধারণ চিকিৎসা সেবায় নানা ধরনের অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে জনগণের চিকিৎসা সেবা গ্রহণে নানা ধরনের দুর্ভোগ লক্ষ করা গেছে। যা বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

স্বাস্থ্যসেবা কর্মীগণ যেহেতু সরাসরি করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসে সেহেতু তাদের সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এছাড়া তার মাধ্যমে তার পরিবার ও অন্যান্য রোগীদের সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হলে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমও ব্যাহত হয়। সেই কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মোকাবিলা পরিকল্পনায় বলা হয় সংক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্বেই সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সকল ধরনের গাইডলাইন ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিউরসমূহ হালনাগাদ ও সংশোধন করা, প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান, সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা চিকিৎসকদের চিহ্নিত করা এবং তাদের মনিটরিং করা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী সংগ্রহ, সরবরাহ ও পুনঃসরবরাহ নিশ্চিত করা, সকল হাসপাতালে সন্দেহভাজন রোগী সনাক্তকরণের জন্য ট্রায়াজ ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে গাইডলাইন বিতরণ, হাসপাতালসমূহের সংক্রমণ প্রতিরোধের সক্ষমতা মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

৫.১ বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত:করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৪ জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৩৮ জন চিকিৎসক এবং সাত জন নার্স মৃত্যুবরণ করেছে। ১৪ জুন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ১১৯০ জন এবং আক্রান্ত নার্সের সংখ্যা ১১০২ জন।[১১৮] বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হওয়ার কারণ নিম্নরূপ-

৫.১.১ পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতি:স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১১ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি) প্রায় ২৫ লক্ষ নয় হাজার ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ করেছে এবং সারাদেশে ২২ লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৫টি পিপিই বিতরণ করেছে এবং তাদের কাছে এখনও প্রায় দুই লাখ ২৫ হাজার সুরক্ষা সামগ্রী মজুদ আছে।[১১৯]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত হেলথ বুলেটিন অনুসারে বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ হাজার।[১২০] সেই হিসেবে প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর অন্তত ৩০ সেট করে পিপিই পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক স্বাস্থ্যকর্মী এখনও একটিও পিপিই পাননি বলে অভিযোগ করেছেন। গবেষণায় অন্তভর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসকসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী যারা প্রত্যক্ষভাবে সম্মখুসারিতে কাজ করে তাদের বড় একটা অংশ এখনও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পায়নি।

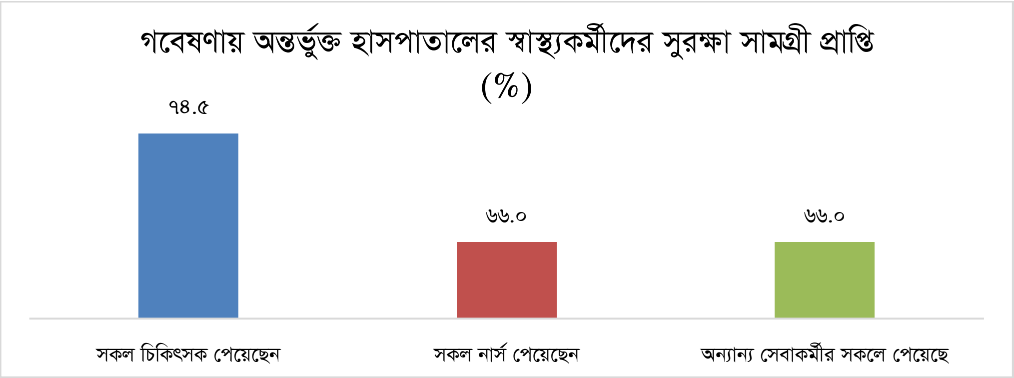

হাসপাতালগুলোর মধ্যে ৭৫শতাংশ হাসপাতালের সকল চিকিৎসক, ৬৬% শতাংশ হাসপাতালের সকল নার্স এবং সম্মুখসারির সকল স্বাস্থ্যকর্মী (টেকনিশিয়ান, ওয়ার্ডবয়, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদি) সুরক্ষা সামগ্রী পেয়েছেন। বাকী হাসপাতালের কর্মীদের একাংশ সুরক্ষা সামগ্রী পেয়েছেন। অনেক স্বাস্থ্যকর্মী ব্যক্তিগতভাবে সুরক্ষা সামগ্রী কিনে নিচ্ছেন। করোনা ডেডিকেটেড একটি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক জানিয়েছেন এই হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্সসহ ২৭৪ জন স্বাস্থ্যকর্মীর সবাইকে পিপিই দেওয়া হয় না, রোগীর সরাসরি সংস্পর্শে গিয়ে যারা চিকিৎসা দেন কেবল তাদের পূর্ণাঙ্গ পিপিই দেওয়া হয়।[১২১]

অভিযোগ আছে, করোনা ভাইরাস শনাক্তে কিট ও সুরক্ষা সামগ্রী মজুত না থাকার পরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বারবারই বলেছেন, এসবের কোনো সংকট হবে না। পর্যাপ্ত মজুত আছে।[১২২]

৫.১.২ নিরাপত্তা সামগ্রীর মান: সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিযোগ মানহীন পিপিই ব্যবহার করার কারণে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনায় করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের যারা চিকিৎসেবা দেবেন তাদের

[১১৮]এন টিভি, অনলাইন নিউজ, ১১ জুন, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ntvbd.com/bangladesh/-755449
[১১৯]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বুলেটিন, ৯ জুন, ২০২০
[১২০]স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হেল বুলেটিন, ২০১৮
[১২১]দৈনিক সমকাল, ২৯ এপ্রিল, ২০২০, https://samakal.com/bangladesh/article/200421011
[১২২]দৈনিক ভোরের কাগর, ৩১ মার্চ, ২০২০https://www.bhorerkagoj.com/2020/03/31/

জন্য পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পারে এমন পিপিই নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলো বিশেষ উপকরণ রয়েছে যা সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এর একটি উপকরণও বাদ পড়লে সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ পিপিই বলা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, দেশের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যে মানের পিপিই সরবরাহ করা হয়েছে তাতে এসব নিশ্চিত করা হয়নি। অধিকাংশ হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ পিপিই সরবরাহ করা হয়নি। পৃথকভাবে গাউন, গগলস, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস বেশি পাঠানো হয়। মাঝে মধ্যেশু কভার ও হেড মাস্ক পাঠানো হয়। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানান, এগুলোকে পিপিই না বলে রেইনকোট বলা যায়।[১২৩]গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর মধ্যে ৬৪ শতাংশ হাসপাতাল থেকে জানানো হয় যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী তাদের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করা হয়নি।

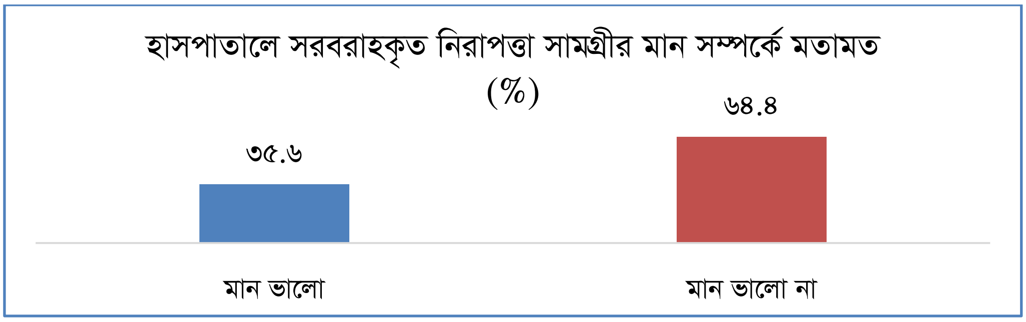

৫.১.৩ দুর্নীতি:বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের মহাসচিব ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী অভিযোগ করেন, মানহীন পিপিই কিনে সেগুলো হাসপাতালে সরবরাহ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে পাঁচ থেকে ১০ গুণ বাড়তি মূল্যে এসব মানহীন পণ্য ক্রয় করে একটি চক্র লাভবান হচ্ছে।[১২৪]

বিভিন্ন হাসপাতালে এন-৯৫ মাস্ক লেখা মোড়কে সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছিল। এবিষয়ে ঢাকার একজন এমপি লিখিতভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পায়। পরবর্তীতে এই মাস্ক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের (সিএমএসডি) পরিচালকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। ওই প্রতিষ্ঠানটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, তারা এন-৯৫ মাস্কের বাক্সে সাধারণ মাস্ক ভুলবশত সরবরাহ করেছে। কিন্তু মূল্য নেওয়া হয়েছে সাধারণ মাস্কের। আর সিএমএসডিও এন-৯৫ মাস্কের কার্যাদেশ দেয়নি। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানই এন-৯৫ মাস্ক তৈরির অনুমতি পায়নি। ফলে তাদের এই ব্যাখা গ্রহণযোগ্য নয়। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে পিপিই, মাস্কসহ বিভিন্ন সামগ্রীর একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার ক্রয় করছে। এই ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সিএমএসডি'র দুই-একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়া অন্যরা কিছুই জানতো না। এতে করে কোনো সামগ্রীর মূল্য কত তা জানা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ সামগ্রী মৌখিক আদেশে সরবরাহ করা হয়েছে। আবার লিখিতভাবে যেসব কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোরও মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।[১২৫]

৫.১.২ স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা সামগ্রী বন্টণে অনিয়ম: গবেষনায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলো থেকে নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম চিত্র উঠে আসে। অনেক প্রতিষ্ঠানে মজুদ থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ সামগ্রী বন্টন করা হয় নি (৭.৭%) এবং নিরাপত্তা সামগ্রী বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য (৫.১%) অর্থাৎ পছন্দের সহকর্মীদের মধ্যে বা শুধুমাত্র কর্মকর্তা পর্যায়ে সুরক্ষা সামগ্রী বন্টণের বিষয়টি উঠে এসেছে।

৫.১.৬ চিকিৎসকদের শোকজ ও বদলি: মানহীন ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই) ও মাস্ক নিয়ে প্রশ্ন করায় কয়েকজন চিকিৎসককে শোকজ করা হয়। একজন চিকিৎসক এসব মানহীন মাস্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাকে এই সময়ের মধ্যে দুবার বদলি করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ফাউন্ডেশন ফর ডক্টরস সেইফটি, রাইটস অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটিজের (এফডিএসআরআর) চেয়ারম্যান বলেন, 'দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকদের কাছে থেকে আমরা নিম্নমানের পিপিই সরবরাহের খবর নিয়মিতই পাচ্ছি। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এসব নিম্নমানের পিপিই ব্যবহারের ফলে শত শত ডাক্তার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। এভাবে যারা ডাক্তারসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন, তদন্তসাপেক্ষে তাদের বিচার হওয়া উচিত।' কিন্তু বিচার দূরের কথা, উল্টো প্রতিবাদকারী অনেক চিকিৎসককেই শোকজসহ নানা রকমের হয়রানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।[১২৬]

৫.১.৫ পিপিই ছাড়াই চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ:মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং সুরক্ষা সামগ্রীর ঘাটতির কারণে একটি হাসপাতালের পরিচালক স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজ দায়িত্বে সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের নির্দেশ প্রদান করলে তাকে শাস্তি হিসেবে বদলি করা

[১২৩]দৈনিক সমকাল, ২৯ এপ্রিল, ২০২০, https://samakal.com/bangladesh/article/200421011
[১২৪]দৈনিক সমকাল, ২৯ এপ্রিল, ২০২০, https://samakal.com/bangladesh/article/200421011
[১২৫] দৈনিক সমকাল, ২৩ এপ্রিল, ২০২০, https://samakal.com/bangladesh/article/200420249/
[১২৬]বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ এপ্রিল, ২০২০, https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/04/26/524385

হয়।[১২৭] যথাযথভাবে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ করতে না পারার কারণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে দায়িত্বহীনভাবে সুরক্ষা পোশাক ছাড়াই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করা হয়। [১২৮]

৫.১.৩ সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারে প্রশিক্ষণের ঘাটতি: সরবরাহ করা পিপিই কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, ব্যবহারের পর কীভাবে জীবাণুমুক্ত করে খুলতে হবে- এসব বিষয়ে অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর্মীর ধারণা নেই। ফলে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীর সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

৫.১.৪ করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি:এনভায়রনমেন্ট এন্ড স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তাদের একটি গবেষণায় দেখায় যে, করোনা সংকটকালের প্রথম একমাসে স্বাস্থকর্মী এবং বিভিন্ন মানুষের ব্যবহৃত ১৪ হাজার ৫০০ টন সংক্রামক প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে সার্জিক্যাল ফেস মাস্ক, গ্লোভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতল, পলিথিন শপিং ব্যাগ ইত্যাদি অন্যতম। শুধুমাত্র হাসপাতালগুলো থেকে এক মাসে ২৫০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে। এই সকল সংক্রামক বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এবং ব্যাপক পরিবেশ দুষণের ঝুঁকি তৈরি করেছে।[১২৯]

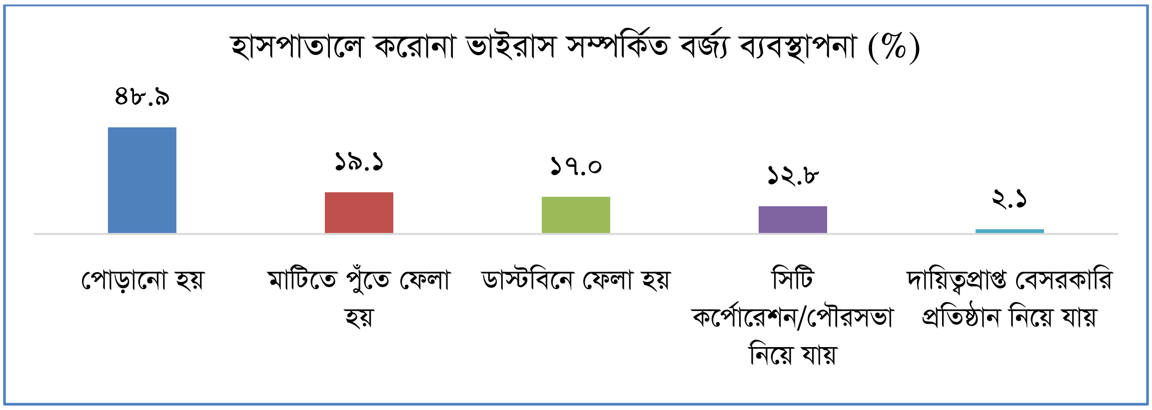

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোতে দেখা যায় যে ৬৮ শতাংশ হাসপাতাল তাদের ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ করোনা সংক্রান্ত বর্জ্য মাটিতে পুঁতে ফেলছে বা পুড়িয়ে ফেলছে।

প্রায় ১৩ শতাংশ হাসপাতাল থেকে সংক্রামক বর্জ্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এসে নিয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের চারটি সিটি কর্পোরেশনে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহীতে) আংশিকভাবে মেডিক্যাল বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা হলেও বাকী জেলাগুলোতে এই সুযোগ নেই। ফলে প্রায় ৩২ শতাংশ হাসপাতালের বর্জ্য যেখানে সেখানে ফেলা হচ্ছে, যা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করছে।

ঢাকা শহরের বর্জ্য বাণিজ্যের সাথে যুক্ত একটি চক্র বিভিন্ন হাসপাতাল হতে ফেলা দেওয়া ব্যবহৃত বর্জ্য সংগ্রহ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করার পর আবার তা বাজারজাত করছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ের‌্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত এরকম ৩৪ বস্তা ব্যবহৃত মাস্ক, পিপিই ও গ্লাভস জব্দ করেছে । সেখানে আনুমানিক ২৫-৩০ লাখ পিপিই ও কয়েক লাখ মাস্ক ছিল। এসকল ব্যবহৃত সামগ্রী পরিস্কার করে ঢাকার মিটফোর্ড মার্কেটসহ বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।[১৩০]

৫.১.৪ নন-কোভিড হাসপাতালগুলোতে ট্রায়াজ ও স্ক্রিনিং ব্যবস্থা না থাকা: বাংলাদেশে শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ হচ্ছে। তবে সাধারণ চিকিৎসার হাসপাতালগুলোতে এ ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে না মানায় সেগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই আক্রান্ত রোগী হতে চিকিৎসক, নার্সসহ চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। কোথাও কোথাও পুরো হাসপাতাল বা ইউনিট লকডাউন হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ মতে সকল হাসপাতালে ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা এখনও চালু না হওয়ার জন্য দায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নজরদারির অভাব। কোভিডের জন্য নির্ধারিত নয় এমন সাধারণ হাসপাতালগুলোতে ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা শুরু থেকে মেনে চলা হয়নি বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বীকার করেন।[১৩১]

৫.১.৫ চিকিৎসকদের আবাসন ও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থায় ঘাটতি: চিকিৎসকদের নিরাপত্তার স্বার্থে নিয়ম করা হয়েছে যেতারা ১৪ দিন কাজ করার পর ১৪দিনের কোয়ারেন্টাইনে যাবেন। তারপর তারা পরিবারের সাথে সময় কাটাবেন। আর এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়

[১২৭]https://www.dhakatimes24.com/2020/03/25/157162/
[১২৮]দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ মার্চ, ২০২০, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1646926/
[১২৯]দ্য ডেইলি স্টার, ১১ মে, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/-1901494
[১৩০]দৈনিক সমকাল, ২৫ এপ্রিল, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/capital/article/200420542/
[১৩১]বাংলা ট্রিবিউন, ৩০ এপ্রিল, ২০২০, https://www.banglatribune.com/others/news/621365

ব্যাচটা কাজ করে কোয়ারেন্টাইনে যাবে। তারপর প্রথম ব্যাচ পরিবারের সাথে সময় কাটানোর শেষে আবার কাজে ফিরে আসবে।[১৩২] এজন্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহের মধ্যে বেশ কিছু হাসপাতালে এখনও চিকিৎসকদের জন্য যথাযথ কোয়ারেন্টাইন আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি (২৪ শতাংশ)।

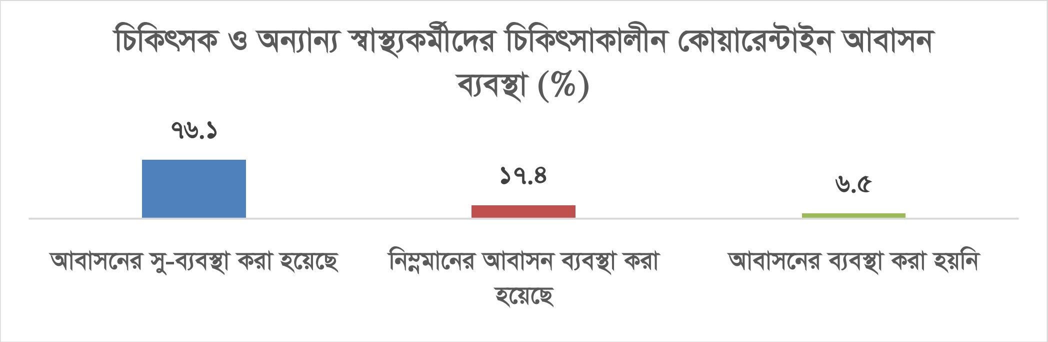

৫.৬ উপসংহার:চিকিৎসা কার্যক্রম যথাযথভাবে জারি রাখার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মানসম্পন্ন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ, হাসপাতালসমূহে সন্দেহভাজন রোগী সনাক্তকরণের জন্য ট্রায়াজ ও স্ক্রিনিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয় নি। যার ফলে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমণের শিকার হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে এবং যা সার্বিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যহাত করেছে।

[১৩২]BBC Bangla, ২১ এপ্রিল, ২০২০,https://www.bbc.com/bengali/news-52372727

ষষ্ঠ অধ্যায়

কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধ

৬.১ সংক্রমণ প্রতিরোধে বিদেশ হতে আগমন নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

চীনের উহান শহরে করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্কতা জারী করার পর ২১ জানুয়ারি থেকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীন থেকে আসা নাগরিকদের স্ক্রিনিং শুরু করে। তার দুই সপ্তাহ পর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশে যেকোনো পথে এবং প্রতিটি দেশ থেকে আসা সব যাত্রী স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা হয়। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর ২১ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেদেশে ফিরে এসেছেন ৬,২৪,৭৪৩ জন।[১৩৩]

সারনীঃ ২১ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত যাত্রীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	আগমনের এন্ট্রি পয়েন্ট	আগত যাত্রীর সংখ্যা (জন)
১	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	৩০৯,১৩৮
২	বিভিন্ন স্থলবন্দর	৩০০,৬২১
৩	চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর	৭,৯৫৫
৪	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশন	৭,০২৯
মোট আগত যাত্রীর সংখ্যা		**৬,২৪,৭৪৩**

১৫ মার্চ হতে ইউরোপ ও অস্বাভাবিকভাবে আক্রান্তদেশগুলো থেকে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ইউরোপের মধ্যে শুধু যুক্তরাজ্য এ ঘোষণার আওতামুক্ত ছিল। এ ছাড়া পণ্যবাহী বিমান চলাচল অব্যাহত ছিল। একইসাথে বিশ্বের সব দেশের নাগরিকদের জন্য অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ২১ মার্চ যুক্তরাজ্য, চীন, থাইল্যান্ড ও হংকং রুট ব্যতীত সকল রুটে বিমান বন্ধ করা হয়।[১৩৪] সর্বশেষ, ২৮ মার্চ হতে চীন ছাড়া সব আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[১৩৫]

অতিমারী হিসেবে ঘোষণার প্রায় দুইমাস পর সকল দেশের ফ্লাইট বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় - ১৫ মার্চ ইউরোপ ও পরে ২১ মার্চ থেকে অস্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত দেশ থেকে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল বন্ধ হলেও যুক্তরাজ্য, চীন, থাইল্যান্ড ও হংকং থেকে ফ্লাইট অব্যাহত ছিল।

৬.২ দেশের বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্টে স্ক্রিনিং ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাঃ

উচ্চ ঝুঁকিতে থাকায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশের প্রবেশ রোধে সব বিমান, নৌ ও স্থলবন্দরে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহসব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ারদাবী করে সরকার। কিন্তু বাস্তবে বিমান ও স্থলবন্দরগুলোতে বিদেশ প্রত্যাগত যাত্রীদের স্ক্রিনিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার চিত্র ছিল দুর্বল। বিভিন্ন বন্দরে করোনা আক্রান্ত শনাক্তে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও ছিল না।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্তে সারাবিশ্বে বন্দরগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে থার্মাল স্ক্যানার। ২১ জানুয়ারি হতে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিদেশ প্রত্যাগত মোট যাত্রীসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ প্রবেশ করে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে। অথচ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনটি স্ক্যানারের দুটিই ছিল নষ্ট। অন্যদিক চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর,বেনাপোল স্থলবন্দর ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের থার্মাল স্ক্যানার সমূহের সবকয়টিই নষ্ট ছিল। এই সকল বন্দরের স্ক্রিনিংয়ের কাজ চলেছে হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানারের মাধ্যমে।

২২ মার্চ ২০২০ জাতীয় রোগতত্ত্ব,রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, দেশে মোট ৭টি থার্মাল স্ক্যানার থাকলেও এর ছয়টিই বিকল। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩টির মধ্যে মাত্র একটি থার্মাল স্ক্যানার সচল রয়েছে।[১৩৬]

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে করোনা ভাইরাস। কিন্তু বেনাপোলে ভারতীয় ট্রাক ড্রাইভারদের পরীক্ষা করা হচ্ছে না। কলকাতাগামী ট্রেনযাত্রীরা স্ক্যানিংয়ের বাইরে রয়েছেন। ক্যান্টনমেন্ট রেলস্টেশনেও নেই থার্মাল স্ক্যানিং মেশিন। এ বিষয়ে কোনো তথ্যও নেই স্টেশন মাস্টারের কাছে।

[১৩৩]দেশ রূপান্তর, "হুমকি হয়ে উঠেছেন সোয়া ছয় লাখ বিদেশফেরত",https://www.deshrupantor.com/first-page/2020/03/19/205353
[১৩৪]সমকাল, "রাত ১২টা থেকে ১০ দেশের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ বন্ধ",https://samakal.com/bangladesh-others/article/200316119
[১৩৫]প্রথম আলো, "চীন ছাড়া সব রুটে ফ্লাইট বন্ধ ৭ এপ্রিল পযর্ন্ত ", https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1647509
[১৩৬] বাংলা ট্রিবিউন, "একটি থার্মাল স্ক্যানার দিয়েই চলছে শাহজালাল বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-সিলেটেরটি নষ্ট",https://tinyurl.com/y7xz3m95

পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে স্থাপিত মেডিক্যাল ক্যাম্পের কার্যক্রমজিজ্ঞাসাবাদেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।মাত্র দুটি থার্মোমিটার ছাড়া কোনো যন্ত্রপাতি নেই, রয়েছে জনবল সংকট।চীনের প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল ও ভুটান হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য এই বন্দর ব্যবহার করা হয়।[১৩৭]

সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরে শুধু পায়ে হাঁটা যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। ভারত থেকে আসা ট্রাক ড্রাইভাররা থেকে যাচ্ছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাইরে।আখাউড়া স্থলবন্দরেও হ্যান্ডহেল্ড স্ক্যানারে চলছে যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

দেশের অন্যতম বৃহৎ স্থলবন্দর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশনে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের নেই স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা। হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোষ্টে মেডিক্যাল টিমের নামে বসিয়ে রাখা হয়েছে একজন স্বাস্থ্য সহকারীকে। কোন যন্ত্রপাতি নেই। অথচ এই ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট দিয়ে প্রতিদিন পারাপার হয় প্রায় এক হাজার দেশি-বিদেশি পাসপোর্টধারী যাত্রী।[১৩৮]

দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরে থার্মাল স্ক্যানার বা হ্যান্ড-হেল্ডস্ক্যানারের অভাব ও কার্যকর প্রয়োগের ঘাটতির কারণে এই স্ক্রিনিং ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। আবার এই সকল স্ক্যানার দিয়ে শুধুমাত্র যাত্রীদের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু করোনা আক্রান্ত রোগীর কোনো ধরনের লক্ষণ নাও থাকতে পারে। ফলে সার্বিকভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্টে গৃহীত পদক্ষেসমূহ কার্যকর হয় নি।

৬.৩ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা

করোনা ভাইরাস সংক্রমিত চীনের উহান রাজ্য থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ৩১২ জনকে দেশে ফেরত আনার পর পূর্বঘোষণা অনুযায়ীসতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তাদেরকে রাজধানীর আশকোনার হজক্যাম্পে নিয়ে 'কোয়ারেন্টাইন' (পৃথক) রাখা হয়। তবে হজ্জ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাংলাদেশিরা সেখানকার অব্যবস্থাপনা নিয়ে অভিযোগ করেন। তাদের মতে, ক্যাম্পেবাচ্চাদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গণরুমের মতো এক রুমে ৪০ থেকে ৫০ জনকে থাকতে হয়েছে। এছাড়া পানি ও টয়লেটের সংকট রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতেও হজ্জ ক্যাম্প মানসম্পন্ন কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা ছিল না। এখানে একসঙ্গে অনেক মানুষকে রাখা হয়েছিল, যারা একই টয়লেট ব্যবহার করেছেন, একই সঙ্গে খাবার খেয়েছেন, যা এ ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণে মোটেও উপযুক্ত ছিল না।

পরবর্তীতে ১৪ মার্চইতালি থেকে আসা ১২৬ জন যাত্রীকে হজ ক্যাম্পে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।কিন্তু ক্যাম্পের নোংরা পরিবেশ, এবং থাকার অনুপযোগী এমন অভিযোগে সেখানে কোয়ারেন্টিনে থাকতে অস্বীকৃতি জানান এবং ক্যাম্পের প্রবেশমুখে বিক্ষোভ করেন। ফলশ্রুতিতে তাদেরকে নিজ দায়িত্বেবাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ, দেশি-বিদেশি ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৯৫৩ জন আকাশ, স্থল ও নৌপথ ব্যবহার করে বাংলাদেশে এসেছেন। আর এই সময়েহোম কোয়ারেন্টিনে (সঙ্গনিরোধ) আছেন ৩৭ হাজার ৩৮ জন। অর্থাৎ সাড়ে ৮ শতাংশের কম মানুষ নিয়ম মেনে ঘরে থাকছেন। সংশ্লিষ্টজেলার পুলিশ সুপার, জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জন এর মতে, তালিকায় থাকা বেশির ভাগ প্রবাসীকে তাদের ব্যবহৃত ঠিকানায় খুঁজে পাওয়া যায়নি।[১৩৯]বিদেশ ফেরতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, তারা বাংলাদেশে তথ্য লুকোচ্ছেন, করোনার কোয়ারেন্টাইন নীতি মানছেন না। বিদেশ ফেরত যাত্রীদের কেউ কেউ কোয়ারেন্টাইন এড়ানোর জন্য পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। অন্তত তিনজনকে একারণে জরিমানা করা হয়েছে। বিদেশ ফেরতদের বড় অংশই হোম কোয়ারেন্টিনে না থেকে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে ঘোরাঘুরি করার মাধ্যমে সারা দেশে সংক্রমণ বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন।

বাংলাদেশে সরকারিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বিদেশ থেকেফেরা মানুষদের ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। এই নির্দেশ না মানলে জেল-জরিমানার কথাও বলা হয়েছিল।কিন্তুবিদেশ ফেরত অনেকেই- বিমানবন্দর, স্থলবন্দর বা সমুদ্রবন্দরে তাদেরকে সেই পরামর্শ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন।[১৪০]বিদেশ ফেরতদের সচেতনতার অভাব এবং প্রশাসণের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোম কোয়ারেন্টাইন কার্যকর হয় নি।

৬.৪ অভ্যন্তরীণ চলাচল ও জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতায় অকার্যকর লকডাউন ব্যবস্থা

দেশে ৮ মার্চ সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিত হলেও, এর বিস্তার রোধে প্রায় দশদিন পরে ১৭ মার্চ হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[১৪১] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণার পর সচেতনতার অভাবে বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় মানুষের ঢল নামে। এ

[১৩৭]ইত্তেফাক, “বিমান ও স্থলবন্দরে দুর্বল ব্যবস্থাপনা”, https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/135272

[১৩৮] বাংলানিউজ২৪,“করোনা ভাইরাস: ঢাকা ছাড়া সব বন্দরেই অব্যবস্থাপনার চিত্র”,https://tinyurl.com/ybd39u9l

[১৩৯]প্রথম আলো, “৮% মানুষ হোম কোয়ারেন্টিনে”, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1646914/

[১৪০]বিবিসি নিউজ, “করোনাভাইরাস: বাংলাদেশে 'হোম কোয়ারেন্টিন' কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে”, ttps://www.bbc.com/bengali/news-51894706

[১৪১]প্রথম আলো, “স্কুল-কলেজে ছুটি ৩০ মে পর্যন্ত”,https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1654960

পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ও সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে ১৮ মার্চ কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতসহ আশপাশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে পর্যটক আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন।

দেশে সংক্রমণ শুরু হওয়ার প্রায় একমাস পর ৬ এপ্রিলইবাদত বা ধর্মীয় উপাসনা নিজ ঘরে করার নির্দেশ দিয়েছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে সাধারণ ছুটি চলমান অবস্থায় ৭ মেহতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সাপেক্ষে মসজিদে মুসল্লিদের প্রবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে সরকার।[১৪২] অথচ সারা দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমে বেড়েই চলেছে।

২৬ মার্চ সরকারিসাধারণ ছুটি ঘোষণায় মানুষ স্রোতের মতো গ্রামে ছুটেছে। সাধারণ ছুটি ঘোষণার পূর্বে গণ পরিবহণ বন্ধ না করায় বিপুল পরিমাণে মানুষ ঢাকা ত্যাগ করে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে যাত্রীবাহী বাস, লঞ্চ ও ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেও বিকল্প পথে হাজারো মানুষ বাড়ি ফিরেছে। কেউ খোলা ট্রাকে, কেউবা কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ি, আবার কেউ পণ্যবাহী পরিবহনে করে গ্রামে ফিরে গেছে। হাজারো মানুষ গ্রামে ফিরে যাওয়ার এই দৃশ্য অনেকটা ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার মতো ছিল।

অন্যদিকে সাধারণ ছুটি ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পোশাক শ্রমিকদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ফলে তাদেরকে মরিয়া হয়ে ঢাকায় ফিরতে হয়েছে। ঢাকায় ফেরার পর ছুটির সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের তথ্য জানানো হয়েছে। পোশাক শ্রমিকদের আবার গ্রামে ফেরত পাঠানো হয়। ২৬ এপ্রিল পুনরায় গার্মেন্টস খোলার সিদ্ধান্ত হয়। এইভাবে বারবার বিপুল সংখ্যক মানুষের দেশব্যাপিপরিভ্রমণের কারণে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়েছে।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে চরম আতঙ্কের মধ্যেই ২১ মার্চ ঢাকা-১০, বাগেরহাট-৪ ও গাইবান্ধা-৩ আসনের সংসদ উপ-নির্বাচন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন দায়িত্বহীন আচরণ করে। বিভিন্ন মহলের থেকে উপ-নির্বাচন স্থগিতের দাবি উঠলেও এবং আইইডিসিআর কর্তৃক ইভিএমে ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকির কথা জানানো পরেও ভোট আয়োজনের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল নির্বাচন কমিশন।[১৪৩]

২৫ মার্চ খালেদা জিয়ার মুক্তির পর হাসপাতাল থেকেবের হওয়ার সময় করোনা প্রতিরোধে জনসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী সেখানে জমায়েত হয়। তাদের সরাতে পুলিশ পরে লাঠিপেটা করে, তবে পূর্ব-প্রস্তুতি থাকলে এই কর্মী সমাগম এড়ানো যেতো। একইভাবে, করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে দেশব্যাপি সাধারণ ছুটির (লকডাউন) মধ্যেই ১৮ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়একজন ধর্মীয় নেতার জানাজা নামাজে লক্ষাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রেও স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন জনসমাগম রোধে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

২৬ এপ্রিল পুনরায় গার্মেন্টস ও ১০ মে হতে দোকান-পাট, শপিং মল সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়ার ঘোষণায় লকডাউন পরিস্থিতি অনেকাংশে দূর্বল হয়ে পড়ে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, সাধারণ ছুটির ভেতরেই পোশাক কারখানার শ্রমিকদের একবার ঢাকায় আনা, আবার তাদের ফেরত যাওয়া, হোটেল রেস্টুরেন্ট সীমিত আকারে খুলে দেওয়া, ঈদের আগে শপিং মল খুলে দেওয়ার কারণে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের শেষে মানুষ সংক্রমিত হয়েছে বেশি। বর্তমানে আবার সাধারণ ছুটি তুলে দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ সংক্রমণের ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাস বিষয়ক জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির মতে, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে শিথিল করা হলে রোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।[১৪৪]

সার্বিক বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় প্রণোদনায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, বিমানবন্দর অরক্ষিত রাখা ও দেশে ফেরা প্রবাসীদের কার্যকরকোয়ারেন্টিন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। দ্বিতীয় ধাপে গণপরিবহন বন্ধ না করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ ছুটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে করোনাকে ঢাকা থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া। এবং তৃতীয়ত, গার্মেন্টস শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষেরঅমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে কোনও অবস্থান না নেওয়া।

[১৪২]বাংলা ট্রিবিউন, “মুসল্লিদের জন্য মসজিদ উন্মুক্ত”,https://www.banglatribune.com/national/news/622374/
[১৪৩] সমকাল, “করোনায় নিস্প্রাণ এক নির্বাচনের গল্প”,https://samakal.com/bangladesh/article/200316000
[১৪৪] বাংলা ট্রিবিউন, “কঠিন সময়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ”,https://www.banglatribune.com/others/news/625928/

সপ্তম অধ্যায়

করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি

সর্বপ্রথম ২৫ মার্চ ২০২০, করোনাভাইরাস মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ৫ এপ্রিল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে নতুন করে ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১২ এপ্রিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনার ঘোষণা দেওয়া হয়। এরই ধারাবহিকতায় সর্বশেষ ৩১ মে ১৯তম প্যাকেজ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের দুই মাসের সুদ মওকুফ করতে সরকারের পক্ষ থেকে দুই হাজার কোটি টাকার আরেকটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।এই ১৯টি প্রণোদণা প্যাকেজের মোট পরিমাণ এক লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা, যা ১২.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ এবং জিডিপির ৩.৭ শতাংশ। নিম্নের সারণীতে ৩০ মে পর্যন্ত সরকার ঘোষিত সকল প্রণোদনা প্যাকেজের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

সারণী: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহ (৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)
প্যাকেজ নং ১	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা	৩০,০০০
প্যাকেজ নং ২	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা	২০,০০০
প্যাকেজ নং ৩	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (Export Development Fund) এর আকার বৃদ্ধি	১২,৭৫০
প্যাকেজ নং ৪	প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম	৫,০০০
প্যাকেজ নং ৫	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধ	৫,০০০
প্যাকেজ নং ৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১০০
প্যাকেজ নং ৭	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০
প্যাকেজ নং ৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০৩
প্যাকেজ নং ৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিতরণ	২৫১
প্যাকেজ নং ১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে নগদ অর্থ বিতরণ	১,২৫৮
প্যাকেজ নং ১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫
প্যাকেজ নং ১২	গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০
প্যাকেজ নং ১৩	বোরো ধান/চাল ক্রয় কার্যক্রম (অতিরিক্ত দুই লক্ষ মে:টন)	৮৬০
প্যাকেজ নং ১৪	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	২০০
প্যাকেজ নং ১৫	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০
প্যাকেজ নং ১৬	ক্ষুদ্র ও মাঝারি গ্রামীণ কৃষকদের জন্য কৃষি পুণঃ অর্থায়ন স্কিম	৫,০০০
প্যাকেজ নং ১৭	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী/ কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুণঃ অর্থায়ন স্কিম	৩,০০০
প্যাকেজ নং ১৮	উদ্দীপনা প্যাকেজ/কর্মসংস্থান কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন)	২,০০০
প্যাকেজ নং ১৯	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাংক ঋণ গ্রহিতাদের দুই মাসের সুদ মওকুফে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর স্থগিত সুদের উপর ভর্তুকি	২,০০০
	সর্বমোট পরিমাণ	**১০৩,১১৭**

৭.১ প্যাকেজ-১: ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণসুবিধা প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংশ্লিষ্ট শিল্প বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকেএই ঋণের ব্যবস্থা করবে। এ ঋণসুবিধার সুদের হার

হবে ৯ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ ঋণগ্রহীতা শিল্প বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে পরিশোধ করবে।

এই প্যাকেজ বাস্তবায়নে এক বছরে সরকারের সুদ বাবদ খরচ হবে ১৩৫০ কোটি টাকা। করোনাভাইরাসে সকলেই ক্ষতিগ্রস্তহলেও সবাইকে এই সুবিধার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক নয়। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে যথেষ্ট সক্ষম নয়, তারাএই ঋণের জন্য মনোনীত হওয়া উচিত। তাছাড়া ব্যাংক নিজস্ব ফান্ড থেকে এই ঋণ বিতরণের কারণে ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বিচারে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত অনেকেই এই ঋণ সুবিধা পাবেন না। এক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ক্লায়েন্ট বাছাই এবং ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নিয়মনীতি বিস্তারিত ও সতর্কভাবে প্রণয়ন করতে হবে।[১৪৫]

৭.২ প্যাকেজ-২: ক্ষুদ্র (কুটিরশিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটালসুবিধা প্রদান: ব্যাংকব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণসুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেবে।এ ঋণসুবিধার সুদের হার হবে ৯ শতাংশ। ঋণের ৪ শতাংশ সুদ ঋণগ্রহীতা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে পরিশোধ করবে।

ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেবে। এখানেও ব্যাংক নিজস্ব ফান্ড থেকে এই ঋণ বিতরণের কারণে ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বিচারে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত অনেকেই এই ঋণ সুবিধা পাবেন না।এক্ষেত্রে অনেকে আছেন যাদের কোলাট্যারল নেই। এখানেও সামর্থ্যবানরাই ঋণ পাবেন, যাদের হয়তো বেশি ঋণের প্রয়োজন বা চাহিদা নেই। ঋণ না পেলে যাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুকি রয়েছে, তাদের অধিকাংশ এই ঋণ সুবিধার বাইরে রয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।[১৪৬]

৭.৩ প্যাকেজ-৩: বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (ইডিএফ) সুবিধা বাড়ানো: ব্যাক টু ব্যাক এলসির আওতায় কাঁচামাল আমদানি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইডিএফের বর্তমান আকার ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে। ফলে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ইডিএফ তহবিলে যুক্ত হবে। ইডিএফের বর্তমান সুদের হার লাইবর + ১.৫ শতাংশ (যা প্রকৃত পক্ষে ২.৭৩ %) থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হবে। ০.৭৩ শতাংশ সুদ কমানোটা এক্ষেত্রে প্রণোদনা। উদ্যোগটি ভালো, তবে প্রকৃত উদ্যোক্তাকে এই ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৪ প্যাকেজ-৪: প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণসুবিধা চালু করবে। এ ঋণসুবিধায় সুদের হার হবে ৭ শতাংশ।রপ্তানিকে তরান্বিত করবে বিধায় এটি একটি ভালো উদ্যোগ।

৭.৫ প্যাকেজ-৫: রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শুধুমাত্র শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি আপৎকালীন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।অনুদান বা দান হিসাবে নয়, শিল্প-মালিকদের এই টাকা দেওয়া হবে শর্তসাপেক্ষে দুই শতাংশ হারের সুদে ঋণ হিসাবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা হচ্ছে, উৎপাদনের ৮০ শতাংশের কম রপ্তানি করে, এ জাতীয় গার্মেন্টস ও শিল্পে কর্মরত শ্রমিক এ সুবিধা পাবেন না। এটিও একটি ভালো উদ্যোগ। তবে সঠিক বেতন ভাতা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করাপোশাক খাতে একটা চ্যালেঞ্জ।

৭.৬ প্যাকেজ-৬:চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ সম্মানি দেওয়ার উদ্দেশে ১৩ এপ্রিল সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেওয়া হয়। যেসব সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যক্ষভাবে করোনাভাইরাস রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের তালিকা তৈরির মাধ্যমে বিশেষ সম্মানী দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়।[১৪৭]

তবে এই প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মাননার নির্দেশনা দেওয়া হযেছে। তবে এক্ষেত্রে বেসরকারি স্বাস্থ্য-কর্মীদেরকে বিবেচনায় আনা হয়নি। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী করোনাভাইরাস আক্রান্তের চিকিৎসা দিতে যেয়ে নিজে আক্রান্ত হয়ে ২৮ জন চিকিৎসক মারা গেছেন।এই ২৮ জনের মধ্যে আট জন চিকিৎসক বেসরকারি হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ তারা ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হননি।[১৪৮]

৭.৭ প্যাকেজ-৭:করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্র বাহিনী ও বিজিবি সদস্য এবং প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মচারীর জন্য ১৩ এপ্রিল ২০২০ সরকারের পক্ষ থেকে বীমার ব্যবস্থা করার ঘোষণা দেওয়া হয়। দায়িত্ব পালনকালে যদি কেউ আক্রান্ত হন, তাহলে পদমর্যদা অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য

[১৪৫]দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ড নিউজ, "সরকারের ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা ও তার সম্ভাব্য প্রভাব", https://tinyurl.com/yaxtvyvq
[১৪৬]প্রাগুক্ত
[১৪৭]প্রথম আলো, " মনোবল হারাবেন না, দেওয়া হবে বিশেষ সম্মানী: চিকিৎসকস্বাস্থ্যকর্মীদের প্রধানমন্ত্রী",https://tinyurl.com/y97phs73
[১৪৮]ডেইলি স্টার, "সরকার শুধু সরকারি লোকজনের জন্য?",https://tinyurl.com/yaky3nkj

৫ থেকে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্যবীমা এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫ গুণ পরিমাণ জীবন বীমার সিদ্ধান্ত হয়। স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনবীমা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৫০ কোটি টাকা।[১৪৯]

৭.৮ প্যাকেজ-৮: স্বল্প-আয়ের মানুষদের বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করার জন্য ৫ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ১ লাখ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মোট মূল্য ২ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা।

৭.৯ প্যাকেজ-৯:শহরাঞ্চলের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ওএমএস-এর আওতায় ১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আগামী তিন মাসে ৭৪ হাজার মেট্রিক টন চাল এই কার্যক্রমের আওতায় বিতরণ করা হবে। এ জন্য ২৫১ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

৭.১০ প্যাকেজ-১০: দিনমজুর, রিকশা বা ভ্যান চালক, মটর শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, পত্রিকার হকার, হোটেল শ্রমিকসহ অন্যান্য পেশার মানুষ যারা দীর্ঘ ছুটি বা আংশিক লকডাউনের ফলে কাজ হারিয়েছেন তাদের নামের তালিকা ব্যাংক হিসাবসহ দ্রুত তৈরির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হলে এককালীন নগদ অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হবে। এ খাতে ১,২৫৮কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে।

৭.১১ প্যাকেজ-১১: সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত 'বয়স্ক ভাতা' ও 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা' কর্মসূচির আওতা সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১০০টি উপজেলায় শতভাগে উন্নীত করার ঘোষণা। বাজেটে এর জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৮১৫ কোটি টাকা।

৭.১২ প্যাকেজ-১২: জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত অন্যতম কার্যক্রম গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত। এ বাবদ সর্বমোট ২,১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কেউ গৃহহীন থাকবে না।

৭.১৩ প্যাকেজ-১৩: কৃষি খাতে ঘোষিত অপর একটি প্রণোদনার অংশ হিসেবে, কৃষকদের উৎপাদিত বোরো ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে চলতি মৌসুমে গত বছরের চেয়ে ২ লাখ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ধান ক্রয় করা হবে। এজন্য অতিরিক্ত ৮৬০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

৭.১৪ প্যাকেজ-১৪: কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ধান কাটা ও মাড়াই কাজে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহায়তার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়কে এই টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে।

৭.১৫ প্যাকেজ-১৫:কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।[১৫০]স্বল্পমূল্যে সার-বীজ কেনা, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রকল্প এবং স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে কৃষিঋণ বিতরণে এই ভর্তুকির অর্থ ব্যবহৃত হবে। আদতে কৃষি খাতে এটি নতুন কোনো বরাদ্দ নয়। কৃষি যন্ত্রপাতি বাবদ ২০০ কোটি টাকা এবং কৃষি ভর্তুকি বাবদ ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ মূলত বাজেট বরাদ্দেরই পুনঃকথন।

৭.১৬ প্যাকেজ-১৬:কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম হিসেবে ৫ হাজার কোটিটাকার একটি তহবিল গঠন করা হচ্ছে। এ তহবিল হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের কৃষি, মৎস্য, ডেইরি এবং পোল্ট্রি খাতে বিদ্যমান ও নতুন ঋণে সুদহার হবে ৪ শতাংশ। যদিও ব্যাংকগুলো সুদ পাবে ৯ শতাংশ হারে। বাকি ৫ শতাংশ ভর্তুকি হিসেবেদেবে বাংলাদেশ ব্যাংক।২০২১ সালের জুন পর্যন্ত এ সুবিধা পাবেন কৃষকেরা। এই তহবিল থেকে চলতি মূলধন পাবে মৌসুমভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মাছ চাষ, পোলট্রি ও ডেইরি এবং প্রাণিসম্পদ খাত। প্রথমে শস্য ও ফসল খাত এর বাইরে ছিল। করোনা ভাইরাসের কারণে বর্তমানে আমদানি বিকল্প এসব ফসলের পাশাপাশি ধান, গমসহ সব দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাকসবজি ও কন্দাল ফসল চাষের জন্যও ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ পাবেন কৃষকেরা।[১৫১]

নীতিমালা অনুযায়ী, চলতি মূলধন পাবে মৌসুমভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মাছ চাষ, পোলট্রি ও ডেইরি এবং প্রাণিসম্পদ খাত। কৃষকেরা ছাড়াও যেসব উদ্যোক্তা উৎপাদিত কৃষি পণ্য কিনে সরাসরি বিক্রি করে থাকেন, তাঁরাও এই স্কিমের আওতায় ঋণ নিতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এককভাবে পাঁচ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে কৃষির যে খাতগুলোয় এই ঋণ দেওয়া হবে, তার কোনো একক খাতে ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণের ৩০% এর অধিক ঋণ বিতরণ করতে পারবে না।[১৫২]

বাংলাদেশ ব্যাংক ১ শতাংশ সুদে ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেবে। ব্যাংক তা সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ সুদে কৃষকদের দেবে। এই ঋণ সর্বোচ্চ দেড় বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে। প্রথম ছয় মাস কৃষকেরা ঋণ পরিশোধে বিরতি পাবেন এবং পরের ১২ মাসে তা শোধ করতে হবে।ব্যাংক গ্রাহকদের ঋণ বিতরণ করবে, তাই ঋণ আদায়ের সব দায়দায়িত্ব ব্যাংকেরই। ব্যাংক ঋণ আদায় করতে না পারলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক হবে না। যদি ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা জমা না দেয়, তবে

---

[১৪৯]প্রথম আলো,"মনোবল হারাবেন না, দেওয়া হবে বিশেষ সম্মানী: চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রধানমন্ত্রী",https://tinyurl.com/y97phs73

[১৫০]যুগান্তর,"কৃষিতে ভর্তুকি ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা",https://tinyurl.com/yad4gyh3

[১৫১]প্রথম আলো, "৫ নয়, ৪ শতাংশ সুদে ঋণ পাবেন কৃষক", https://www.prothomalo.com/economy/article/ 1650577

[১৫২]প্রথম আলো, "প্রণোদনা থেকে কৃষক আসলে কী পাবে?",https://www.prothomalo.com/opinion/article/1652576/

বাংলাদেশ ব্যাংক ওই ব্যাংকের হিসাব থেকে টাকা কেটে নেবে। এই তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে যথাযথ ব্যবহার না হলে অতিরিক্ত ২ শতাংশ হারে সুদসহ এককালীন আদায় করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।[১৫৩]

প্রতি অর্থবছরে ব্যাংকগুলোর জন্য ২ শতাংশ কৃষিঋণ বিতরণে বাধ্যবাধকতা থাকার পরও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। তাই ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে গ্রাহক পর্যায়ে ও ব্যাংক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকায় ব্যাংকগুলো কৃষকদের মাঝে এই ঋণ বিতরণে আগ্রহী না হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা কৃষি ও পল্লিঋণের চলতি নীতিমালায় ঋণ পরিশোধে ৩৬ থেকে ৫৪ মাস (গ্রেস পিরিয়ডসহ) সময় রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কৃষকের চেয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণে অধিক আগ্রহী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[১৫৪]

৭.১৭ প্যাকেজ-১৭:সরকার "নিম্ন আয়ের পেশাজীবী/ কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুণঃ অর্থায়ন স্কিম" শীর্ষক নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য তিন হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এই তহবিল বিতরণ নীতিমালায় বন্ধক বা মর্টগেজ ছাড়া ঋণ সুবিধা পাবেন প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। নীতিমালা অনুযায়ী, নারী ও বিভিন্ন পেশার মানুষও এ তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবেন। তবে ইতিপূর্বে যারা ঋণ খেলাপি হয়েছেন তারা এ তহবিল থেকে ঋণ সুবিধা পাবেন না।

এই প্যাকেজের আওতায় এনজিওর মাধ্যমে গ্রহীতাদের এ ঋণ দেবে ব্যাংক। এর ফলে ঋণ নিতে ব্যাংকের মতো মর্টগেজ বা বন্ধক রাখার প্রয়োজন হবে না। এনজিও গ্রহিতাদের ঋণ দেবে। সেক্ষেত্রে এনজিওগুলো অতিরিক্ত সুদ আদায় রোধে মনিটরিং করা হবে।অতি দরিদ্র ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা রাখা হয়েছে এ নীতিমালায়। নারীদের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, অর্থায়নকারী ব্যাংকের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ হবেন আমানত গ্রহণকারী এনজিও। এনজিওগুলো সাধারণ মানুষকে ঋণ দেবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ব্যাংক, এনজিও ও ঋণ গ্রহিতা প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট লভ্যাংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।এ তহবিলের আওতায় ঋণের যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ নেই। কারণ এই আমানত গ্রহণকারী এনজিওকে তাদের বিগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে। ঋণের মেয়াদ চলাকালে ঋণগ্রহীতার কোন সমস্যার ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় বীমার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[১৫৫]

৭.১৮ প্যাকেজ-১৮:১৪ মে ২০২০,করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উদ্দীপনা প্যাকেজ বা কর্মসৃজন কার্যক্রম নামে দুই হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। ১৮তম এই প্যাকেজে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনকে ৫০০ কোটি করে সর্বমোট ২০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা দেওয়া হবে।[১৫৬]

৭.১৯ প্যাকেজ-১৯:ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাংক ঋণ গ্রহিতাদের সুদ মওকুফ করতে সরকারের পক্ষ থেকে দুই হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এই প্যাকেজে গৃহীত ঋণের দুই মাসের সুদ স্থগিত করা হয়েছে, যার পরিমাণ ১৬ হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা। এই স্থগিত সুদের মধ্যে দুই হাজার কোটি টাকা সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করবে। ফলে আনুপাতিক হারে ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের তা পরিশোধ করতে হবে না।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঋণ গ্রহীতাদেরকে যে দুই মাস সব কিছু বন্ধ ছিল, সেই দুইমাসের জন্য ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হবে না। এই সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সুদের অবশিষ্ট অর্থ ১২টি মাসিক কিস্তিতে বাণিজ্যিকব্যাংকগুলোকে ঋণ গ্রহীতারা পরিশোধ করবেন। এক্ষেত্রে সরকারের দুই হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি প্রদানের ফলে প্রায় এক কোটি ৩৮ লাখ ঋণ গ্রহীতা, যারা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন,সরাসরি উপকৃত হবেন।[১৫৭]

৭.২০ সার্বিক বিশ্লেষণ: ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত ঘোষিত ১ লক্ষ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্যাকেজের প্রায় ৯২ শতাংশ স্বল্প সুদে ব্যাংক নির্ভর প্যাকেজ ঋণ সুবিধা। অন্যদিকে বর্তমান বাস্তবতায় অধিকাংশ ব্যাংক তাদের বিদ্যমান ভালো গ্রাহক ছাড়া নতুন কাউকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করবে। যে সকল ব্যাংকের ঋণ প্রদানের তারল্য রয়েছে, তারা মূলত ভালো ও পরীক্ষিত গ্রাহকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দেবে, নতুন করে ঝুঁকি নিতে চাইবে না। কারণ, সরকার প্রণোদনার আওতায় প্রদত্ত ঋণের দায়িত্ব নিচ্ছে না,কেবল মাত্র সুদের একটা অংশ এক বছরের জন্য পরিশোধ করবে। আবার এই ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকছে না। ফলে ব্যাংকগুলো তাদের প্রদেয় অংশের অর্থ ভালো গ্রাহকদেরমাঝে বিতরণ করবে। সরকার এই ঋণ আদায়ের ঝুঁকির অংশীদার না হওয়ায় ব্যাংকগুলো প্যাকেজের ঋণ বিতরণে আগ্রহ দেখাবে না। কারণ এতে ব্যাংকের ঝুঁকি আছে, কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতা ছাড়া কোনো অনুপ্রেরণা নেই। এক্ষেত্রে সরকার প্রণোদনা প্যাকেজের বিতরণকৃত ঋণের লোকসানের দায়িত্ব নিলে ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণে আগ্রহ দেখাতে পারে।[১৫৮]এছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাংকিং খাতে অব্যবস্থাপনার সংকট,

---

[১৫৩]প্রথম আলো, "৫ নয়, ৪ শতাংশ সুদে ঋণ পাবেন কৃষক", https://www.prothomalo.com/economy/article/1650577/

[১৫৪]প্রথম আলো, "প্রণোদনা থেকে কৃষক আসলে কী পাবে?", https://www.prothomalo.com/opinion/article/1652576/

[১৫৫]যুগান্তর, "বন্ধক ছাড়াই ঋণ পাবেন কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা", https://tinyurl.com/yar6cptj

[১৫৬]বনিক বার্তা, "তিন ব্যাংক ও পিকেএসএফের মাধ্যমে ২ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা" https://tinyurl.com/yb49x86q

[১৫৭]ডেইলি স্টার, "ব্যাংক ঋণের ২ হাজার কোটি টাকা সুদ মওকুফের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর", https://tinyurl.com/y7454rrm

[১৫৮]দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ড নিউজ, "সরকারের প্রণোদনার ৫০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ও ছোট ব্যবসার জন্য একটি সংযোজনী প্রস্তাব", https://tinyurl. com/ y7xm5wux

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও খেলাপি ঋণের বড় ধরনের সংকট আছে। এমন সংকটগ্রস্ত ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য একটা পথনির্দেশিকা প্রয়োজন।[১৫৯]

বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা মোকাবেলায় এক লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে আরও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রকৃত ভুক্তভোগীর কাছে এ সুবিধা পৌঁছানো। কারণ প্যাকেজের অধিকাংশ কার্যকর করা হবে ব্যাংকের মাধ্যমে। অনেক ক্ষতিগ্রস্ত আছেন যাদের সঙ্গে ব্যাংকের সম্পৃক্ততা নেই। তাদের কাছে কিভাবে এ সুবিধা পৌঁছানো হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া প্যাকেজের পুরো অর্থ সংগ্রহ অন্যতম চ্যালেঞ্জ। চলতি বাজেটে এ প্যাকেজ বাস্তবায়নে কোনো অর্থ বরাদ্দ নেই। এতবড় প্যাকেজ কার্যকরে অতীতের অভিজ্ঞতা না থাকাও অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ফলে এটি স্বচ্ছতার সঙ্গে নিশ্চিত করা কঠিন কাজ। সর্বশেষ হচ্ছে, আমলতান্ত্রিক জটিলতা। সরকারের এ বৃহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে জাতীয় মনিটরিং কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছেন অর্থনীতিবিদরা।[১৬০]

জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে সম্পৃক্ত। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে প্রায় পাঁচ কোটি দিনমজুর ও শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মী।সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকা এই শ্রমিক শ্রেনী ছাড়াও অনেক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তও ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে। অথচ ঘোষিত আর্থিক প্যাকেজে অনানুষ্ঠানিক খাতে প্রত্যক্ষ বরাদ্দ নেই।৫০ লাখ পরিবারকে মাসে ২৫০০ টাকা অর্থ সহায়তা পর্যাপ্ত নয়।আবার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আয়-ক্ষতি পুষিয়ে নিতে যে ধরনের প্যাকেজ দরকার ছিল, সেটাও যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। বিশেষ করে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ না করে শুধু জরুরি ত্রাণ বিতরণের মতো কিছু সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।[১৬১]

বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনার প্রভাবে তাঁতি, কুমার, শিল্পী, ছোট দেশীয় পোশাক ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রামীণপর্যায়ে কর্মসংস্থানের গতি, দারিদ্র্য বিমোচন হার ও স্বাভাবিক অর্থনীতির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে। অনেক ছোট ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা আছেন যাদের সঙ্গে ব্যাংকের সম্পর্ক কম। ফলে সরকার এসএমই শিল্পের জন্য ঋণ প্যাকেজ ঘোষণা করলেও ব্যাংকগুলো এসব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী শনাক্ত করতে পারবে না।[162]

বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিরও অনেক দূর্বলতা আছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট, আইসোলেশন ও হাইজিন আচরণ পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়নি। এমনকি লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রযোজনীয় সহায়তার ধরণও সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, সব ধরনের স্থবির অর্থনৈতিক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসায়ীদের ওপর কোটিকোটি মানুষের কর্মসংস্থান ও আয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ ঋণ পাওয়ার শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণেসকল ব্যবসায়ী ঋণ পাবেন না। সেক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাছে এই ঋণ বা প্রণোদনার সুবিধা পৌছাবে না। এছাড়া জরুরি ভিত্তিতে মৌলিক চাহিদা পূরণে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থ সঞ্চালনের রূপরেখা এই প্যাকেজে নেই। সরকার নগদ অর্থ প্রদান ও খাদ্যসহায়তার মাধ্যমে ব্যয় সম্প্রসারণ নীতির পরিবর্তে, সুদ কমিয়ে ঋণসহায়তা বাড়িয়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছে।

কৃষকদের জন্য শুধু ঋণ দেওয়াই যথেষ্ট নয়, সংকট সমাধানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কৃষি উপকরণের সরবরাহ ব্যবস্থাটা সচল রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। উৎপাদন খরচ না বাড়ায় ধান সরকারের চাল সংগ্রহ অভিযানের জন্য বেধে দেওয়া দামে কৃষকের লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে। তবে এক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের এড়িয়ে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি চাল কেনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।[১৬৩]

সরকার ঘোষিত আর্থিক প্যাকেজের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য-খাতে বড় বরাদ্ধ প্রয়োজন, যেটা অনুপস্থিত। কম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি খরচ কমিয়ে বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কয়েকগুণ বাড়ানো প্রয়োজন।[১৬৪]

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখতে তিন স্তরে তদারকি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রথমতঃ, প্যাকেজ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি তদারকি বা মনিটরিং টিম গঠন করা হবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রতিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের (এমডি) নেতৃত্বে আলাদা আলাদা মনিটরিং সেল গঠন করা হবে। আর এ দুটি সেলের কার্যক্রম তদারকি করবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেল। মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ যৌথভাবে এ তদারকির কাজ করবে।মনিটরিংয়ের মূল কাজ হবে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা। এক্ষেত্রে প্যাকেজের অর্থের

---

[১৫৯]প্রথম আলো, “সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আরও বরাদ্দের প্রয়োজন ছিলঃ সানেম", https://tinyurl.com/y846mjbq

[১৬০]**যুগান্তর** ,"এক লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ, বাস্তবায়নে চার চ্যালেঞ্জ",https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/299455

[১৬১] বনিকবার্তা, “সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় প্রদত্ত সহায়তা কতটুকু মানানসই?”,https://tinyurl.com/yaepos8j

[১৬২]**যুগান্তর** ,"এক লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ, বাস্তবায়নে চার চ্যালেঞ্জ",https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/299455/

[১৬৩]ডয়েচ ভেল, “ঋণে কৃষি সংকটের সমাধান হবে না", https://tinyurl.com/ycmarnhh

[164] শেয়ারবিজ, “প্রণোদনা প্যাকেজে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর সুপারিশ সানেমের” https://tinyurl.com/y7zsjf45

সঠিক ব্যবহার, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থদের ঋণ প্রদান, ঋণখেলাপি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বিতরণে বিরত রাখা হবে পর্যবেক্ষণের মূল উদ্দেশ্য।[১৬৫]

[165] বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, "করোনায় ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দেশ", https://tinyurl.com/ydxlcmsw

অষ্টম অধ্যায়

ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

করোনা মোকাবেলায় সরকারি ত্রাণ কার্যক্রমে তালিকা প্রণয়নে অনিয়ম ও বিতরণে অদক্ষতা ও সমন্বয়হীনতা এবং ত্রাণ সামগ্রী চুরি ও আত্মসাৎসহ বিভিন্ন প্রকার অনিয়ম ও সংঘটিত দুর্নীতির চিত্র বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন হতে জানা যায়। টিআইবি পরিচালিত গবেষণায়ও এ সম্পর্কিত সুশাসনের ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

৮.১ ত্রাণ বিতরণে প্রস্তুতির ধরন: ত্রাণ বিতরণে প্রস্তুতির ধরণের ক্ষেত্রে দেখা যায়,সঠিকভাবে চাহিদা নিরূপণ না করেই উপকারভোগীর সংখ্যা প্রকাশ এবং বিক্ষিপ্তভাবে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। গবেষণাভুক্ত ৪৩টি এলাকার প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মাত্র ২২% ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা হালনাগাদ করা হয়, ২০% ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণের জন্য কোনও পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া হয় নি, ত্রাণ বিতরণে কমিটি গঠন করা হয় প্রায় ৫৮% এবং ত্রাণ বিতরণের জন্য সচেতন নাগরিকদের সাথে মতবিনিময় করা হয় প্রায় ৯% এলাকার ক্ষেত্রে।

৮.২ চাহিদা অনুপাতে ত্রাণ বা খাদ্য সহায়তা দেওয়ার পরিমাণ:চাহিদাঅনুপাতে ত্রাণ বা খাদ্য সহায়তা দেওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি লক্ষ করা যায়। গবেষণাভুক্ত৪৩টি এলাকার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৮২% এলাকায় চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম পরিমাণে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ দেওয়ার বিষয়টি কোন এলাকাতেই লক্ষ করা যায় নি।

৮.৩ ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়: ত্রাণ বিতরণের সঠিক পরিকল্পনা ও সমন্বয় না থাকায় এবং বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিরা ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়। গবেষণাভুক্ত ৪৩টি এলাকার প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, কোনও ধরনের সমন্বয় না করে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ করা হয় ৬০% এলাকার ক্ষেত্রে।

সারণী : ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়

ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়	এলাকা (%)
সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ	৩৯.৫
কোনও ধরনের সমন্বয় না করে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ	৬০.৫

৮.৪ সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে সমস্যার ধরন: করোনাপরিস্থিতি মোকাবেলায় দুস্থ, অসহায়, ও কর্মহীন মানুষদের সরকারি খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিতে নিরপেক্ষ তালিকা করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ও কর্মহীনদের বাদ দিয়ে নিজেদের খুশিমতো তালিকা তৈরি করার অভিযোগ রয়েছে।[১৬৬] তাছাড়া সরকারি ত্রাণের চাল আত্মসাত[১৬৭], সুবিধাভোগীর নাম একাধিকবার এন্ট্রি করা[১৬৮], ত্রাণের চাল বস্তা পাল্টিয়ে অন্য নামের বস্তায় ঢুকিয়ে বিক্রি করা[১৬৯], খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির চাল ভুয়া মাস্টাররোল তৈরি এবং মৃত ব্যক্তির নামে মাস্টাররোল তৈরি করে আত্মসাৎ[১৭০], খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল কালো বাজারে বিক্রির চেষ্টা[১৭১], ডিলার কর্তৃক টিসিবির পণ্য কালো বাজারে বিক্রি[১৭২], টিসিবির নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল ও তেল) বাড়িতে লুকিয়ে রাখা এবং সেগুলো অনেক বেশি দামে গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করার[১৭৩] অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও করোনাকালীন সংকটের কারণে সরকার ঘোষিত হতদরিদ্র ৫০ লাখ পরিবারের জন্য আড়াই হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা কার্যক্রমের উপকারভোগীদের তালিকায় ক্ষেত্রবিশেষে বিত্তশালী ও জনপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছল আত্মীয়-স্বজনের নাম থাকার চিত্র বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[১৭৪] একই মোবাইল নম্বর ব্যবহৃত হয়েছে সর্বোচ্চ ২০০ বার।[১৭৫] একই মোবাইল নম্বর একাধিকবার দেয়ায় ৮ লাখ নম্বর বাতিল করা হয়।[১৭৬] গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার শতভাগ ক্ষেত্রেই অতি দরিদ্রদের নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়।

---

[১৬৬]বিস্তারিত,https://www.banglatribune.com/country/news/620524/
[১৬৭]বিস্তারিত, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1656003/; https://www.ittefaq.com.bd/national/148459/
[১৬৮] বিস্তারিত, https://www.somoynews.tv/pages/details/207793/
[১৬৯]বিস্তারিত, https://www.somoynews.tv/pages/details/207024/; https://www.dailyinqilab.com/article/282154/
[১৭০] বিস্তারিত, https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1744293.bdnews; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1655160/; https://www.jugantor.com/covid-19/305369/
[১৭১] বিস্তারিত, https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1745095.bdnews;
[১৭২] বিস্তারিত, https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/04/14/898959; https://www.banglatribune.com/country/news/618203/
[১৭৩] বিস্তারিত, https://www.thedailystar.net/bangla/
[১৭৪]বিস্তারিত, https://www.bd-journal.com/bangladesh/119404/;https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/05/19/913636
[১৭৫] বিস্তারিত, https://www.thedailystar.net/bangla/
[১৭৬]বিস্তারিত, https://www.somoynews.tv/pages/details/214101/

গবেষণাভুক্ত ৪৩টি এলাকার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে ৮১% ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। স্বজনপ্রীতি, নিজ থেকে যোগাযোগ না করলে নাম না উঠানোর ঘটনা ঘটেছে ২৩.৩% এলাকার ক্ষেত্রে। সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে কোন ধরণের সমস্যা হয় নি এ চিত্রটি দেখা যায় মাত্র ২% এলাকার ক্ষেত্রে।

সারণী ১:২: সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে সমস্যার ধরন

সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে সমস্যার ধরন	এলাকা (%)
রাজনৈতিক বিবেচনায় তালিকাভুক্তি	৮১.৪
জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকা	৬৭.৪
স্থানীয় অধিবাসী না হওয়ায় তালিকাভুক্ত না করা	৪৮.৮
চাঁদা দিতে রাজী না হওয়া	৭.৯
স্বজনপ্রীতি, নিজ থেকে যোগাযোগ না করলে নাম না উঠানো	২৩.৩
কোনও ধরনের সমস্যা হচ্ছে না	২.৩

৮.৫ অব্যবস্থাপনার ধরণ: গবেষণাভুক্ত এলাকার (৪৩টি) প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রায় ৯৮% ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে সামাজিক দূরত্ব না মানার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৪২% ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে কোনো তালিকা অনুসরণ না করা এবং ৫৮% ক্ষেত্রে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ত্রাণ বিতরণ করার অভিযোগ রয়েছে।

সারণী ১:৩: ত্রাণ বিতরণে অব্যবস্থাপনার ধরন

অব্যবস্থাপনার ধরন	%
সামাজিক দূরত্ব না মানা	৯৭.৭
পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ত্রাণ বিতরণ	৫৮.১
দুর্ব্যবহার করা	৩২.৬
কোন ধরনের তালিকা অনুসরন না করা	৪১.৯
ছবি তোলার মাধ্যমে হয়রানি/ অধিক মানুষ সমেবেত হওয়া	১৬.৩

৮.৬ ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির ঘটনায় উদ্ধারকৃত পণ্যের ধরণ: গরীব,দুস্থ ও অসহায় মানুষদের জন্য প্রদত্ত ত্রাণ সামগ্রী চুরির ঘটনার প্রেক্ষিতে ত্রাণ উদ্ধারের ঘটনাও প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্র[১৭৭] পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির ২১৮টি ঘটনায় উদ্ধারকৃত চাল ৪,৫৯,৮৭০ কেজি।

সারণী ১.৪: সরকারি ত্রাণ বিতরণে উদ্ধারকৃত পণ্য (পরিমাণ)

উদ্ধারকৃত পণ্যের ধরণ	পরিমাণ
চাল	৪,৫৯,৮৭০ কেজি
চিনি	৩০,৮৫৫ কেজি

[১৭৭] ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত ৬টি সংবাদপত্র পর্যবেক্ষণে ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির ঘটনা মোট ২০৮টি।

ডাল	৫৫০ কেজি
পেয়াজ	৮৫০ কেজি
ছোলা	২৪ বস্তা
সয়াবিন তেল	৮,০২৭ লিটার

উৎস: সংবাদপত্র পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ, ১০ জুন ২০২০ পর্যন্ত

৮.৭ ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও গৃহিত পদক্ষেপ: ত্রাণের চাল চুরিসহ নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংবাদপত্র[১৭৮] পর্যবেক্ষভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার) ৩০% ক্ষেত্রে। এছাড়াও দলীয় নেতা (২৪%), ডিলার (১৭%), ব্যবসায়ী (১৪%), সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী (৪%) ঘটনার ক্ষেত্রে। গৃহিত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আটক করা হয় ২০% ঘটনার ক্ষেত্রে, বিভাগীয় ব্যবস্থা (২০%), গ্রেফতার (১৩%), মামলা দায়ের (১৯%), তদন্তনাধীন (৭%), জরিমানা (৫%), ডিলার লাইসেন্স বাতিল (২%), কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ (৩%) ক্ষেত্রে।

এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর ত্রাণের চাল চুরিসহ নানা অভিযোগে মোট ৮৯ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এরমধ্যে ২৯ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ৫৪ জন ইউপি সদস্য, ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য, ৪ জন পৌর কাউন্সিলর এবং ১ জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান। সামকিভাবে বরখাস্তের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, ত্রাণের চাল ওজনে কম দেওয়া এবং তালিকার বাইরেও অন্যদের চাল দেওয়া, ভূয়া টিপসইয়ের মাধ্যমে চাল উত্তোলন করে আত্মসাত, ভিজিডি খাদ্যশষ্য বিতরণ না করা, ত্রাণকাজে সহায়তা না করে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত, নগদ অর্থ সহায়তা কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রণয়নে ব্যর্থ হওয়া, ত্রাণ চেয়ে সরকারি হটলাইন নম্বরে এক গ্রামবাসী ফোন দেওয়ায় তাকে মারধর করা ইত্যাদি।[১৭৯]

[১৭৮] প্রাগুক্ত।
[১৭৯] বিস্তারিত, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1660179; https://www.banglatribune.com/national/news/626064/

নবম অধ্যায়

অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

৯.১ বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় ব্যর্থতা

বাংলাদেশের ৬৯টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রায় ৫ হাজার বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন ও সমন্বয় করা হয় নি। ৯ এপ্রিল প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকল বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ করোনা চিকিৎসা দিতে প্রস্তুত দাবি করলেও, এই বিপর্যয়ের সময়ে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়; এমনকি তারা অন্যান্য চিকিৎসা সেবাও বন্ধ করে দিয়েছিল, যা বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ ছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সকল বেসরকারি হাসপাতালকে একাধিকবার করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দিলেও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিতে যথাযথ তদারকির ঘাটতি বিদ্যমান।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রম সরকারের একক নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতার ফলে বিভিন্ন কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্যণীয়। সরকারের যথাযথ সহায়তার অভাবে বা বিরোধিতার কারণে বেসরকারি পর্যায়ের বেশ কিছু স্ব-প্রণোদিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতা ও সহায়তার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে- যেমন, বসুন্ধরার হাসপাতাল স্থাপন, বেক্সিমকো কর্তৃক উৎপাদিত রেমডিসিভির ব্যবহারের অনুমোদন। অন্যদিকে, কোনো কোনো বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার অভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বিত হচ্ছে, যেমন- আকিজ গ্রুপের হাসপাতাল স্থাপন, গণস্বাস্থ্যর টেস্ট কিট অনুমোদন।

৯.২ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ:

করোনা ভাইরাসরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রায় বারোটি মন্ত্রণালয়, একাধিক বিভাগ ও কমিটি যুক্ত থাকলেও, সার্বিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্বলতা ও সমন্বয়হীনতার অভিযোগ রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নের্তৃত্বে একটি "জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল" গঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও তা আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় নি, এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এককভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন।

করোনা ভাইরাসরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইসিটি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যুক্ত রয়েছে। করোনা ভাইরাস বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় কমিটি আছে। এছাড়া প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি আছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ (কন্ট্রোল রুম) আছে। এছাড়া সব ধরনের কাজের সমন্বয়নের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে একটি সমন্বিত কন্ট্রোল রুম আছে এবং আইইডিসিআরে পৃথক কন্ট্রোল রুম রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি কন্ট্রোল রুমও করোনা ভাইরাস নিয়ে কাজ করছে।

৯.৩ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আভ্যন্তরীন সমন্বয়হীনতা:

কোভিড- ১৯ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ও মন্ত্রণালয়ের উচ্চ থেকে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় যে ব্যবস্থাপনা দরকার, তার প্রাথমিক ও চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ হলো চিকিৎসা বা ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা, যে কাজটা প্রধানত চিকিৎসকদের। অথচ এক্ষেত্রে শীর্ষ নীতিনির্ধারণী জায়গায় কোনও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নেই।[১৮০] উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিতে চিকিৎসকদের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। চিকিৎসকদের বিভিন্ন সংগঠন থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন সহযোগিতা না নিয়ে "ডক্টরস ফর কোভিড - ১৯ সলিউশন" নামে একটি নতুন সংগঠন গঠন করা হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের গৃহীত কিছু পদক্ষেপ বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক করোনাকালে চিকিৎসকদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে তা প্রত্যাহার করার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। ২৫ মার্চ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক নির্দেশনায় বলা হয়েছিল, 'যদি কোনো রোগীর করোনা ভাইরাস-এর লক্ষণ থাকে, তবে প্রথমে চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দেবেন এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই) পরিধানকৃত দ্বিতীয় চিকিৎসকের কাছে প্রেরণ করবেন এবং তিনি পিপিই পরিহিত অবস্থায় রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করবেন।' সমালোচনার মুখে আদেশটি স্থগিত করা হয়। একই দিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আরেক আদেশে কেউ চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হলে সেনাবাহিনীর তল্লাশি চৌকি বা থানার ওসিকে জানানোর কথা বলা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশন গণপদত্যাগের হুমকি দেওয়ায়, সমালোচনার মুখে সেই আদেশও বাতিল করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিবের ভাষ্য অনুযায়ী, আদেশটি তাঁকে না জানিয়ে করা হয়েছিল।[১৮১]

---

[১৮০]প্রথম আলো, "করোনাকালে চিকিৎসকদের একগুচ্ছ পরামর্শ",https://www.prothomalo.com/opinion/article/1649490/

[১৮১]প্রথম আলো, "করোনা মোকাবিলায় আরও সমন্বয় জরুরি",https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1649811

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ শুরুর পর সরকারি-বেসরকারি সব হাসপাতাল চিকিৎসক শূন্য হয়ে পড়ে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তের উপসর্গ- জ্বর, সর্দি-কাশি থাকলে চিকিৎসকরা রোগীর কাছে যাননি। অন্যান্য অসুখ-বিসুখে যাদের নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়, তারা বিপাকে পড়েন। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিকিৎসকদের সতর্ক করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়; কিন্তু সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং সরকার সেই প্রজ্ঞাপনও বাতিল করে।

একঘন্টার ব্যবধানে করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিদফতর কর্তৃক দুই ধরনের তথ্য দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে করোনা হাসপাতাল তৈরীর বিষয়ে চারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালেও করোনা চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে তা পরিবর্তন করা হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে কয়েক লাখ পিপিই বরাদ্দের কথা বলা হলেও, ডাক্তাররা পর্যাপ্ত পিপিইর অভাবে চিকিৎসা দিতে চাচ্ছেন না। এমনকি ডাক্তার নার্সদের তাদের মাস্ক গ্লাভস নিজেদের ব্যবস্থার জন্যনোটিশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া করোনা চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত মাস্কের পরিবর্তে নকল মাস্ক পাঠানোরও অভিযোগ রয়েছে। এই ফেস মাস্কের গুণগত মান নিয়ে অভিযোগের কারণে দুইজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী নিজে ফেস মাস্কের মান নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই দ্রুততার সাথে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের ৬ জন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়, যা অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং চিকিৎসকদের মনোবল নষ্ট করে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, করোনা সংক্রমণের গতি-প্রকৃতি বুঝতে এবং আক্রান্ত মানুষকে সেবা দিতে দৈনিক কমপক্ষে ৩০ হাজার নমুনা পরীক্ষা দরকার। কিন্তু পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে পরীক্ষা বাড়াতে গিয়ে জনবল, নমুনা সংগ্রহ, ল্যাব রক্ষণাবেক্ষণসহ নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জানুয়ারির শেষ থেকেদেশে করোনা শনাক্তকরণ পরীক্ষা শুরু করে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। রোগ শনাক্তকরণ পরীক্ষার প্রয়োজন বাড়তে থাকলেও আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশসহ (আইসিডিডিআরবি) একাধিক প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিতে কালক্ষেপণ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। গত ২৫ মার্চ থেকে সরকার দেশে ল্যাবরেটরি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।[১৮২]

৯.৪ আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা:

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ৩ ফেব্রুয়ারি করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশকে করণীয় সম্পর্কে একটি গাইডলাইন প্রদান করে। ২১ জানুয়ারি থেকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীন থেকে আসা নাগরিকদের স্ক্রিনিং শুরু করে। এরপর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশে যেকোনো পথে এবং প্রতিটি দেশ থেকে আসা সব যাত্রী স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন স্থল ও বিমান বন্দরে স্থাপিত ৭ টি থার্মাল আর্চওয়ের মধ্যে ৬ টি নষ্ট। এধরণের অকার্যকর স্ক্রিনিং ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন বন্দর দিয়ে ৬.২৫ লক্ষের অধিক বিদেশ ফেরত যাত্রী দেশেপ্রবেশ করেন।

২৩ মার্চ সকলযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু অবস্থায় ২৬ মার্চ হতে সরকারি-বেসরকারি অফিস ছুটি ঘোষণা করে। এই ছুটির ঘোষণায় হাজার হাজার মানুষ ঢাকা ত্যাগ করে। বাস ও লঞ্চ টার্মিনালে এবং রেলস্টেশনে ঘরমুখী মানুষের ভিড়ের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ে। মানুষের ভিড় বাড়তে থাকলে সরকারের পক্ষ থেকেযোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করার ঘোষণা আসে। ২৪ মার্চ রেলমন্ত্রী যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেন। একই দিন নৌযান বন্ধেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। আর ২৬ মার্চ থেকে গণপরিবহন বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এর মধ্যেই অসংখ্য মানুষ ঢাকা ত্যাগ করে, ফলে করোনা ভাইরাস দেশের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

করোনা ভাইরাসের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্তগ্রহণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে করোনা ভাইরাসপ্রতিরোধে গঠিত জাতীয় কমিটি বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এদিকে ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী বলেছিলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিষয়টি তাদের উচ্চপর্যায়ে আলোচনায় ও পর্যবেক্ষণে রয়েছে, সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।[১৮৩]

একইভাবে, করোনা প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য মন্ত্রীর অগোচরে নেওয়া হয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) রাজধানীতে ২৮ এপ্রিল থেকেহোটেল-রেস্তোরাঁয় ইফতার সামগ্রী বিক্রি শুরুর অনুমতি প্রদান করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্তনেওয়ার আগে জাতীয় কমিটির মতামত নেওয়া উচিত ছিল। পূর্বে ৬ এপ্রিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সারাদেশে কার্যত লকডাউনের মাঝে গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের ঢাকায় ফেরা, গার্মেন্টস কারখানা খোলা রাখা, মসজিদে নামাজ বন্ধ, রাস্তা খুলে দেওয়া বা বন্ধ রাখা- এসব বিষয়েও জাতীয় কমিটির সাথে কোন

[১৮২]প্রথম আলো, "করোনা শনাক্তকরণ পরীক্ষা নিয়ে বিশৃঙ্খলা",https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1654851/

[১৮৩]প্রথম আলো, "করোনার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের দাবি জোরদার হচ্ছে",https://www.prothomalo.com/education/article/1645077

আলোচনা হয় নি। তার মতে, জাতীয় কমিটিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে আর কোন তথ্য কমিটির প্রধানকে জানানো হচ্ছে না।[১৮৪]

করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১ মার্চ যে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয় সেখানে প্রথমে পুলিশের মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে জাতীয় কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত আইজিপি জানতেন না এবং মাঠপর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের কোনো নির্দেশনাও দিতে পারতেন না। পরবর্তীতে সমালোচনার কারণে কমিটি সংশোধন করে আইজিপিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জাতীয় কমিটির প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ইতালি থেকেপ্রথম দফায় আসা ১৬৪ জনকে হজ্জ ক্যাম্পে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে রাখা হবে। এ জন্য হজ ক্যাম্প প্রস্তুত করে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয় ধর্ম মন্ত্রণালয়কে। কিন্তু ব্যবস্থাপনাগত ক্রটির কারণে বেশিরভাগ প্রবাসীকে ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং কয়েকজনকে গাজীপুরের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়।

৯.৫ পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের সাথে অমানবিকতা, কারখানা খোলা-বন্ধে সমন্বয়হীনতাঃ

করোনা ভাইরাস সংকটে গার্মেন্টস শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এবং কারখানা চালু ও খোলা রাখা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অবস্থানগত পার্থক্য সর্বোপরি সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি এই খাতের উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বও দ্বায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

সরকারের দেওয়া ছুটি শুরু হলে বিজিএমইএ ২৬ মার্চ কারখানা বন্ধ রাখতে সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানায়। পরদিন বিকেএমইএ একই রকম নির্দেশনা দেয়। কিন্তু ২৮ মার্চ শ্রম মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), ক্রয়াদেশ আছে ও করোনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করছে এমন কলকারখানা খোলা রাখার অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে ১ এপ্রিল বাণিজ্যমন্ত্রী উপস্থিতিতে, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ সাপেক্ষে পোশাক কারখানা চলতে বাধা নেই বলে জানানো হয় এবং ৫ এপ্রিল কারখানা খোলার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে চাকরি হারানোর ভয়ে লকডাউন এবং গণপরিবহন বন্ধের মধ্যেও কাজে যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেটে বা ট্রাকের ছাদে দাড়িয়ে, যেযেভাবে পেরেছে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করেছে। গণমাধ্যমে সারা দেশের মানুষকে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলে ফেরার চিত্র দেখে সমালোচনার প্রেক্ষিতে পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ রাত পৌনে ১০টায় কারখানা বন্ধ রাখতে সদস্যদের প্রতি অনুরোধ করে। বিকেএমইএ কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্তদেয় রাত ১২টায়। এরপর ঢাকায় প্রবেশ ও ঢাকা থেকেবের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

মালিকদের পাশাপাশি সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা ও সমন্বয়হীনতার কারণেই এক ভয়াবহ পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব না মেনে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক ঢাকা ও আশপাশের শিল্পাঞ্চলে ফিরেছেন। আবার কষ্ট সহ্য করে নিজ এলাকায় ফেরত যায়। এর ফলে তাদের মাধ্যমে বিশেষ করে নারায়নগঞ্জে কাজ করা শ্রমিকদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে ধারনা করা হচ্ছে। একইভাবে ২০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কারখানা খোলার বিষয়ে বক্তব্যের পর করোনা সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যেই ২৬ এপ্রিল থেকে রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের প্রায় সব কারখানা খুলে দেওয়া হয়। এবারো দেশব্যাপী গণপরিবহণ বন্ধ থাকায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকেশ্রমিকরা পায়ে হেটে, রিকশা, ভ্যান ও ট্রাকে করে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে কাজে যোগ দিতে ঢাকায় ফেরত আসেন।

৯.৬ ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতা

দুর্যোগ সহায়তা মনিটরিং কমিটি কর্তৃক ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতার অভিযোগে বলা হয়, যে জেলায় দরিদ্র মানুষের হার যত বেশি, সেই জেলায় সরকারের ত্রাণ বরাদ্দ তত কম। ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও সমন্বয়হীনতার সমস্যা দূর করা না হলে দেশে মানবিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।[১৮৫]

---

[১৮৪]সময় নিউজ, “দোকান খোলা নিয়ে কখনোই নির্দেশনা দেয়নি জাতীয় কমিটি”, https://www.somoynews.tv/pages/details/210563/

[১৮৫]সমকাল, “ত্রুটি ও সমন্বয়হীনতার অভিযোগ ত্রাণ বরাদ্দে”, https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/200537757

সারণী: ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতা

জেলার নাম	দরিদ্র মানুষের হার	মাধাপিছু চাল বরাদ্দের পরিমাণ	মাধাপিছু অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ
কুড়িগ্রাম	৭০.৮ শতাংশ (সর্বোচ্চ)	৮৭৪ গ্রাম (সবচেয়ে কম)	মাত্র ৩ টাকা ৮৫ পয়সা (সবচেয়ে কম)
নারায়ণগঞ্জ	২.৬ শতাংশ (সবচেয়ে কম)	২২ কেজি ৫৫৫ গ্রাম (সর্বোচ্চ)	৮৮ টাকা ১৭ পয়সা (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)
মুন্সীগঞ্জ	৩.১ শতাংশ (দ্বিতীয় সর্বনিম্ন)	২১ কেজি ৫১৭ গ্রাম (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)	৯৫ টাকা ৮৩ পয়সা (সর্বোচ্চ)

বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে ৬০ শতাংশ এলাকায় ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবে অভিযোগ রয়েছে। এসকল এলাকায় ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসণ, বেসরকারি সংগঠন ও বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণের ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত ত্রাণ পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল।

সারণী: গবেষণাভুক্ত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের চিত্র

ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়	এলাকা (%)
সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ	৩৯.৫
কোনো ধরনের সমন্বয় না করে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ	৬০.৫

৯.৭ সমন্বয়হীনতা কাটানোর উদ্যোগ:

সমন্বয়হীনতা কাটানোর উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪ সচিবকে সমন্বয়ের দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবরা জেলার সংসদ সদস্য, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে কভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার কাজ তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করবেন। জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতেও সচিবদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর, সংস্থাকে লিখিত আকারে জানাবেন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে নিয়মিত অবহিত করবেন।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুশাসন পরিমাপে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কর্মরত বিশেষজ্ঞগণ ১০টি সুশাসনের উপাদান চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে কৌশলগত দূরদর্শিতা (strategic vision), অংশগ্রহণ ও ঐকমত্য (consensus orientation), আইনের শাসন (rule of law), স্বচ্ছতা (transparency), দ্রুত সাড়াদান(responsiveness), ন্যায্যতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ (equity and inclusiveness), কার্যকরতা ও দক্ষতা (effectiveness and efficiency), জবাবদিহিতা (accountability), তথ্য ও জ্ঞান (intelligence and information), এবং নৈতিকতা (ethics)।[১৮৬] তবে এই গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক সুশাসন নির্দেশকসমূহের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে আইনের শাসন, দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা,এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসন ঘাটতির কারণসমূহ: করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। সুশাসনের এসকল চ্যালেঞ্জ বা ঘাটতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-

১০. আইনের শাসনের ঘাটতি

১০.১ প্রাসঙ্গিক আইন অনুসরণ না করা: করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দুইটি আইন যথা 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' এবং 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮'- এর কোনোটাই যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং এর অধীনে থাকা দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১৯ অনুসরণ না করার ফলে আইন অনুযায়ী বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ ব্যবহার করা যায় নি। এছাড়া 'কোভিড-১৯' সংক্রামক রোগ হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত না থাকার কারণে তা মোকাবিলায় 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮' প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছিল না। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ কোভিড-১৯ কে সংক্রামক রোগ হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি হলেও আইন সংশোধনে বিলম্বের কারণে আইন প্রয়োগ শুরু হওয়ার আগেই বাংলাদেশে কমিনিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংক্রামক রোগ আইন ২০১৮ অনুসারে সারাদেশকে 'সংক্রমিত এলাকা' বা 'দুর্গত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা না করে 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে ঘোষণা করে। যা মাঠ পর্যায়ে আইনের প্রয়োগ ও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

১০.২ দ্রুত সাড়াদানের ক্ষেত্রে বিলম্ব বা ঘাটতি

১০.২.১ সংক্রমণ বিস্তার রোধে বিদেশ হতে আগমন নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি: করোনা ভাইরাসকে অতিমারী হিসেবে ঘোষণা করার পরে বাংলাদেশে প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করা হয়। প্রায় দুইমাস পর সকল দেশের ফ্লাইট বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সর্বপ্রথম ১৫ মার্চ ইউরোপ ও পরবর্তীতে ২১ মার্চ হতে অধিক আক্রান্ত দেশ থেকে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল বন্ধ হলেও যুক্তরাজ্য, চীন, থাইল্যান্ড ও হংকং থেকে ফ্লাইট অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে ২৮ মার্চ হতে চীন ছাড়া সব আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বিদেশ হতে প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে ২১ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৬ লাখ ২৪ হাজার ৭৪৩ জন যাত্রীর আগমন ঘটে। ২১ জানুয়ারি থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চীন থেকে আসা নাগরিকদের স্ক্রিনিং শুরু হয় এবং ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সকল দেশ থেকে আসা যাত্রীদেরকে স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা হয়। তবে দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরে হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার দিয়ে যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হয়, যার মাধ্যমে শুধু শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা যায়। ফলে কার্যকরভাবে করোনা ভাইরাস আক্রান্তকে পৃথক করা সম্ভব হয় নি।

১০.২.২ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কমিটি গঠনে বিলম্ব: ফেব্রুয়ারির শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সতর্ক করা হলেও বাংলাদেশে প্রায় দেড় মাস পর (১৬ মার্চ) 'কোভিড-১৯ এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি ও সাড়া দান পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে। যার ফলে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এছাড়া সংক্রমণ শুরু হওয়ার দেড়মাস পরে (১৮ এপ্রিল) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়।

১০.২.৩ অভ্যন্তরীণ চলাচল ও জন-সমাগম নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা: সংক্রমণ বিস্তার রোধে ১৭ মার্চ হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা, এবং ২৬ মার্চ হতে সারাদেশ ব্যাপি ছুটি ঘোষণা করা হলেও এর সাথে সাথে গণ পরিবহণ বন্ধ না করার কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঢাকা

[১৮৬] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০১৪, Health Systems Governance for Universal Health Coverage: Action Plan, Department of Health Systems Governance and Financing,http://www.who.int/universal_health_coverage/plan_action-hsgov_uhc.pdf?ua=1 (৭ জুন২০২০)।

ত্যাগ করে। যা ঢাকার বাইরে সংক্রমণ বিস্তারের একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বাংলাদেশে সকল ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক গণ জমায়েত নিষিদ্ধ করা হলেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। যেমন, খালেদা জিয়ার জামিন উপলক্ষে দলীয় নেতা-কর্মীদের সমবেত হওয়া এবং মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নির্ধারিত অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল করা সত্ত্বেও আতশবাজি পোড়ানো উপলক্ষে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস যখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছে তখন এই সংকটকালেই নির্বাচন কমিশন একটি সিটি কর্পোরেশনসহ ছয়টি সংসদীয় আসনের উপ নির্বাচন সম্পন্ন করতে দায়িত্বহীন আচরণ করে। যে নির্বাচনসমূহকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনসমাগম ও প্রচার-প্রচারণা লক্ষ করা যায়। পরবর্তীতে ব্যাপক সমালোচনার কারণে কয়েকটি নির্বাচন স্থগিত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের উপসনালয়গুলোতে জমায়েত না করার নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব (৬ এপ্রিল) লক্ষ করা যায়।

১০.২.৪ পরীক্ষাগার প্রস্তুতিতে বিলম্ব: করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধে সকল সন্দেহভাজনের পরীক্ষার বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও ২১ জানুয়ারি হতে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে মাত্র একটি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছিল। ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগারের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ২৫ মার্চের পর ঢাকার বাইরে পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে আইইডিসিআর এর হটলাইনে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করলেও পরীক্ষা করা হয় মাত্র ৭৯৪টি। বাংলাদেশে যখন পরীক্ষাগার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া ততদিনে সীমিত আকারে কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার শুরু হয়ে গেছে।

১০.২.৫ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতিতে বিলম্ব: করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রস্তুতির দাবি করা হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোর প্রায় অর্ধেক হাসপাতালের প্রস্তুতি সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে শুরু হয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতা পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বললেও সকল হাসপাতালের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ঘাটতি বা চাহিদা যাচাই করা হয় নি। হাপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রমের প্রস্তুতি হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রস্তুত করে রাখার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

১০.২.৬ করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনার সীমাবদ্ধতা: করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার দ্রুততার সাথে ১৯টি প্যাকেজে মোট এক লাখ তিন হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা (জিডিপির ৩.৩%) করলেও এক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এসব প্রণোদনা মূলত ব্যবসায়ী-বান্ধব, যেখানে সুদ কমিয়ে ঋণ সহায়তা বাড়িয়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে এই সহায়তা পৌঁছানোরও নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া এই সকল প্রণোদনায় চাহিদার সংকোচন উত্তরণে যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা, মৌলিক চাহিদা পূরণে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থ সঞ্চালন বা পর্যাপ্ত নগদ সহায়তার অনুপস্থিতি, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মহীন পাঁচ কোটি দিনমজুর ও শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মীর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা, মাত্র ১০ শতাংশ বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা, কৃষি প্রণোদনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের জন্য প্রণোদনার সুযোগ না থাকা, কৃষি ঋণ মওকুফের ঘোষণা না থাকা, কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণের সুযোগ দান এবং ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্তকরণ ইত্যাদি ঘাটতিসমূহ লক্ষ করা গেছে।

১০.২.৭ ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রস্তুতিতে ঘাটতি: গবেষণাভুক্ত জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০ শতাংশ এলাকায় ত্রাণ বিতরণের জন্য কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া হয় নি এবং ৭৮ শতাংশ এলাকার ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা হালনাগাদ করা হয় নি। এছাড়া অধিকাংশ এলকায় (৮২%) চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম পরিমাণে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণকৃত ত্রাণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ এলাকায় (৯০%) চাহিদার অনুপাতে অর্ধেক বা তারও কম সংখ্যক উপযুক্ত মানুষ ত্রাণ পেয়েছে।

১০.৩ সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি

১০.৩.১ অকার্যকর কমিটি: করোনা মোকাবিলায় দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নয় ধরনের কমিটি গঠন করা হলেও এসব কমিটির কার্যকরতায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠক ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হলেও সেই মিটিং এ শুধুমাত্র ডেঙ্গু বিষয়ক আলোচনা করে শেষ করা হয়, পরবর্তী এই কমিটির কোনো বৈঠকের তথ্য পাওয়া যায় না। এই কমিটির সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যদের অনেক সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবগত না থাকার বিষয়টি লক্ষ করা গেছে (গার্মেন্টস খোলা ও বন্ধ, ঢাকায় প্রবেশ ইত্যাদি)। এছাড়া জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটিগুলোর কার্যকরতার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়। জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সভা নিয়মিত হলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (শপিং মল/ গার্মেন্টস খোলা, লকডাউন প্রত্যাহার করা) কমিটির পরামর্শ উপেক্ষিত থাকা এবং অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাদের ওপর নির্ভরতা লক্ষ করা গেছে।

১০.৩.২ পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি: বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ হলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম পরীক্ষা হচ্ছে, সারা বিশ্বের মধ্যেও বাংলাদেশ পরীক্ষার হারের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। করোনা আক্রান্তের পরীক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সক্ষমতার ঘাটতির কারণে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশে পরীক্ষাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ ঢাকা কেন্দ্রীক। জেলা পর্যায়ে মাত্র ২১টি জেলায় পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে। টেকনোলজিস্ট সংকট, মেশিন নষ্ট থাকা, জনবল ও মেশিন সংক্রমিত হওয়া ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে মেশিনের

সক্ষমতার সর্বোর্চ্চ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এছাড়া জনবলের সংকটের কারণে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষায় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নমুনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ভুল প্রতিবেদন আসছে। এসকল ঘাটতির কারণে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ ও প্রতিবেদন দিতে কখনও কখনও ৮ দিন পর্যন্ত বিলম্ব লক্ষ করা গেছে।

১০.৩.৩ চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের দাবি করা হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থায় দক্ষ জনবল, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, আইসিইউ ও ভেন্টিলেটর, মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতার ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। যা করোনা আক্রান্তের চিকিৎসাসহ অন্যান্য সাধারণ সেবা কার্যক্রমকে ব্যাহত করেছে।

১০.৩.৪ সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে বিপুল পরিমাণে সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের দাবি অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর ন্যুনতম ৩০ সেট সুরক্ষা সামগ্রী পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক স্বাস্থ্যকর্মী এখনও একটিও পায় নি বলে হাসপাতাল থেকে তথ্য উঠে আসে। এছাড়া অধিকাংশ হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত মান অনুযায়ী সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ না করার অভিযোগও উঠে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পিপিই সরবরাহ না করে পৃথকভাবে গাউন, গগলস, সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস, শু-কাভার, হেড কাভার, ফেস শিল্ড সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কয়েকটি এলাকায় সীমিত আকারে মেডিক্যাল বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা থাকায় বিপুল পরিমাণে করোনা সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে এবং এই বর্জ্যের একটি অংশ একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ি পুনরায় ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করছে। এছাড়া পিপিই এর ব্যবহার, ব্যবহারের পর জীবাণুমুক্ত ও বিনষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি রয়েছে। যার ফলে যথাযথ সুরক্ষার অভাবে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হচ্ছে এবং কমিউনিটিতে করোনা বিস্তার লাভ করছে।

১০.৩.৫ কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ বিস্তার রোধে সক্ষমতার ঘাটতি: বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিং করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রবেশ পথে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। এছাড়া বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থায়ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা গেছে। অধিকাংশ প্রবাসীকে বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে নিজ দায়িত্বে হোম কোয়ারেন্টাইনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। সচেতনতার ঘাটতি, প্রশাসনের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হোম কোয়ারেন্টাইন কার্যকর হয় নি।

১০.৩.৬ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা: সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতার ঘাটতি, কঠোর আইন প্রয়োগের ঘাটতি এবং সরকারের পক্ষ থেকে ভুল ও বিভ্রান্তিকর বার্তা প্রদান - একদিকে আইসোলেশন মানতে বলা হয়েছে আবার অন্যদিকে গণপরিবহণ, কল-কারখানা, শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে সামাজিক দূরত্ব বা লকডাউন ব্যবস্থা কার্যকর হয় নি।

১০.৪ অংশগ্রহণ ও সমন্বয় ঘাটতি

১০.৪.১ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নের্তৃত্বে একটি 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল' গঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও তা আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় নি। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে এককভাবে নির্দেশনা প্রদান করছেন। করোনা ভাইরাস মোকাবিলার অন্যতম বিষয় হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা। অথচ এক্ষেত্রে শীর্ষ নীতি-নির্ধারণী জায়গায় কোনো মেডিসিন বিশেষজ্ঞ নেই। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনাকালে বিভিন্ন বিষয়ে প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করে তা প্রত্যাহার, করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দুই ধরনের তথ্য প্রধান, বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা প্রদান বিষয়ে বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে।

১০.৪.২ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা: করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, যোগাযোগ, বাণিজ্য, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যাশিত হলেও তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রেখেই ছুটি ঘোষণার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢাকা ত্যাগ, জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যানের (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) অগোচরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সারাদেশে কার্যত লকডাউনের মাঝে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঢাকায় ফেরা, গার্মেন্টস খোলা রাখা, মসজিদে জামাতে নামাজ বন্ধ, ঈদের সময় রাস্তা খুলে দেওয়া বা বন্ধ রাখা ইত্যাদি ঘঠনাসমূহ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার বিষয়টি উন্মোচন করে। যা করোনা সংক্রমণের বিস্তার লাভে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া করোনা প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় কমিটিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, যেমন প্রথমে পুলিশের মহাপরিদর্শককে (আইজিপি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, পরবর্তীতে সমালোচনার কারণে কমিটি সংশোধন করে আইজিপিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১০.৪.৩ বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করায় ব্যর্থতা: বাংলাদেশের বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসায় অন্তর্ভুক্ত করতে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন করোনা চিকিৎসায় তাদের প্রস্তুতির দাবি করলেও এই বিপর্যয়ের সময়ে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তারা অন্যান্য চিকিৎসা সেবাও বন্ধ করে দিয়েছে যা বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সকল বেসরকারি হাসপাতালকে একাধিকবার করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দিলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ তদারকির

ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। করোনাভাইরাস মোকাবিলার সকল কার্যক্রম সরকারের একক নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রদানের বিষয়টি লক্ষ করা গেলেও (বসুন্ধরার হাসপাতাল স্থাপন, রেমডিসিভির ব্যবহারের অনুমোদন) ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত (গণস্বাস্থ্যের টেস্ট কিট অনুমোদন) সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণে এবং সরকারের যথাযথ সহায়তার অভাবে বা বিরোধিতার কারণে বেসরকারি পর্যায়ের বেশ কিছু স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১০.৪.৪ ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬০ শতাংশ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণের কারণে অনেক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাওয়ার প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তিরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

১০.৫ স্বচ্ছতার ঘাটতি

১০.৫.১ তথ্য প্রকাশে বিধি-নিষেধ আরোপ: নাগরিকেরসাংবিধানিক অধিকার ও সরকারের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতায় গণমাধ্যমের অবাধ ও মুক্ত ভূমিকা পালনে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতে তথ্য গোপন নয়, তথ্য প্রচারে প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় আরও বেশি অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত অতীব জরুরি।[১৮৭]কিন্তু দেশে করোনার প্রকোপ শুরুর পর থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জনসমক্ষে, সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যা সেবা কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।[১৮৮]

১০.৫.২ মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব: দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণে চুরি ও আত্মসাতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা লক্ষ করা গেছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পরডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর আওতায় মোট ৬৭টি মামলা দায়ের করা হয় এবং এই সময়কালে ৩৭ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কার্টুনিস্ট, সাংবাদিকসহ ৭৯টি ঘটনায় মোট ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[১৮৯] এছাড়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণা বা গুজব মনিটরিং করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ৩০টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য নজরদারি সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলেও নজরদারি অব্যাহত রয়েছে বলে জানা যায়। [১৯০]

১০.৫.৩ করোন ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি:করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরন করেছে এমন অনেকেই সরকারি হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা না হলে, বা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা মৃত ব্যক্তিদের তথ্য কর্তৃপক্ষকে না জানালে তা সরকারি হিসাবে যোগ হচ্ছে না। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন কবরস্থানে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিদের সৎকারের সংখ্যার মধ্যে অমিল রয়েছে। ফলে করোনা ভাইরাসে মৃতের সরকারি হিসাব নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

করোনায় ঢাকায় মৃতদের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯টি কবরস্থানের মধ্যে দুটি কবরস্থানকে করোনা রোগীদের দাফনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, এ দুটি কবরস্থানের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, মে ২০২০ পর্যন্ত করোনা রোগী দাফন করা হয় ৫৭৯ জন। কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা যায়, নয়টি কবরস্থানে শুধু মে মাসেই মৃত ব্যক্তির দাফনের পরিসংখ্যান বিগত চার মাসের (জানুয়ারি ২০২০-এপ্রিল ২০২০) তুলনায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বেশি। যেমন, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দাফন হয় ৫ হাজার ৯৮৩ জনের লাশ, অন্যদিকে মে পর্যন্ত পাঁচ মাসে দাফন হয় ৮ হাজার ৪০৫ জনের।[১৯১] সুতরাং এ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, করোনাকালীন মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেলেও তা নিয়ে পর্যালোচনা হচ্ছে না।

১০.৬ করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতি: করোনা আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহেহতে নিম্নমানের সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের বিষয়ে (৫৯ শতাংশ হাসপাতালের ক্ষেত্রে)সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠে এসেছে।

১০.৬.১ সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি: করোনার কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে পাঁচ থেকে দশ গুণ বাড়তি মূল্যে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করে একটি চক্র লাভবান হচ্ছে এবং এসকল মানহীন সামগ্রী হাসপাতালে সরবরাহ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে এন-৯৫ মাস্ক লেখা মোড়কে সাধারণ সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছিল। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে পিপিই, মাস্কসহ বিভিন্ন সামগ্রী একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে। এই ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং কেন্দ্রীয় ঔষধ প্রশাসনের দুই-একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়া অন্যরা কিছুই জানছে না। এতে করে কোনো সামগ্রীর মূল্য কত তা জানা যাচ্ছে না। বেশিরভাগ সামগ্রী মৌখিক আদেশে সরবরাহ করা হয়েছে। আবার লিখিতভাবে যেসব কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোরও মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।

---

[১৮৭]বিস্তারিত, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/

[১৮৮] বিস্তারিত, https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=224978&cat=1; https://www.dailyinqilab.com/article/284254/

[১৮৯]বিস্তারিত, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661991

[১৯০]বিস্তারিত, https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/03/27/891157; https://www.somoynews.tv/pages/details/204782/

[১৯১] বিস্তারিত, https://www.banglatribune.com/national/news/627331/

১০.৬.২ স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা সামগ্রী বন্টণে অনিয়ম: গবেষনায় জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলো থেকে নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু অনিয়ম চিত্র উঠে আসে। অনেক প্রতিষ্ঠানে মজুদ থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ সামগ্রী বন্টন করা হয় নি (৭.৭%) এবং নিরাপত্তা সামগ্রী বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য (৫.১%) অর্থাৎ পছন্দের সহকর্মীদের মধ্যে বা শুধুমাত্র কর্মকর্তা পর্যায়ে সুরক্ষা সামগ্রী বন্টণের বিষয়টি উঠে এসেছে।

১০.৬.৩ চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি: বর্তমানে তীব্র সংকট মোকাবিলায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থে ভেন্টিলেটর আমদানির পরিকল্পনা নেওয়া হলেও, ক্রয় প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অভিযোগে করোনাকালের ১২ সপ্তাহেও ক্রয়াদেশ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া 'করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জরুরি সহায়তা' শীর্ষক প্রকল্পে অস্বাভাবিক ক্রয় মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে।বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বাড়িয়ে প্রতিটি সামগ্রীর মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে।[১৯২]একটি হাসপাতালে ব্যবহৃত পিসিআর মেশিন থাকা সত্ত্বেও নতুন পিসিআর মেশিনের ক্রয়ের চাহিদা প্রেরণ করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যখাত দুর্নীতিগ্রস্ত থাকার কারণে অনেক অবকাঠামো ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়নি। একটি মেডিক্যাল কলেজে ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা চলমান থাকায় পাঁচ বছর অব্যবহৃত অবস্থায় ১৬টি ভেন্টিলেটর পড়ে ছিল। পরবর্তীতে ১০টি সচল করা হয়।

সারণী: 'করোনাভাইরাস মোকাবিলায় জরুরি সহায়তা' প্রকল্পে দুর্নীতি:

ক্রমিক নং	সরঞ্জাম	প্রস্তাবিত ক্রয় মূল্য (টাকা)	বর্তমান বাজার মূল্য (টাকা)
১	সেফটি গগলস (১ লাখ)	৫০০০	৫০০ - ১০০০
২	পিপিই (১ লাখ ৭ হাজার ৬শত)	৪৭০০	১০০০ - ২০০০
৩	বুট শু (৭৬ হাজার ৬শ জোড়া)	১৫০০	৩০০ - ৫০০
৪	কম্পিউটার সফটওয়্যার (৫ টি)	৫৫ কোটি	স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সফটওয়্যারের দাম গড়ে ৩৩,০০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ২৮ লাখ টাকা)
৫	ওয়েবসাইট উন্নয়ন (৪ টি)	১০.৫ কোটি	ওয়েবসাইট প্রতি ১ হতে ২ লক্ষ টাকা
৬	অডি-ভিডিও ক্লিপ (৩০ টি)	১১.৫ কোটি	বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন অডিও ভিডিও ক্লিপ (১ হতে ২ মিনিট) তৈরির গড় খরচ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বাংলাদেশে একটি সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র তৈরির খরচ ১ হতে ২ কোটি টাকা
৭	গবেষণা	২৯.৫ কোটি	
৮	রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (৩০ টি)	৪৫ কোটি	
৯	ইনোভেশন	৩৬ কোটি	
১০	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের পরিবহনের জন্য গাড়ি ভাড়া	৩৭ কোটি	

১০.৬.৩.১ নিম্নমানের মেশিন ক্রয়: পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ করতে সরকারিভাবে ৩১টি আরটি পিসিআর মেশিন ক্রয় করা হয়। করোনা সংকটকালে বিশ্বব্যাপি চাহিদার কারণে সরবরাহকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সালের পুরানো মডেলের পিসিআর মেশিন সরবরাহ করে। মেশিনের ত্রুটির কারণে কয়েকটি হাসপাতাল এই মেশিন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কয়েকটি পরীক্ষাগারে বারবার পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার এটা একটি কারণ।

১০.৬.৪ পরীক্ষাগারে দুর্নীতি: সরকারের কাছ থেকে বাণিজ্যিকভাবে পরীক্ষার অনুমোদন পাওয়া অধিকাংশ বেসরকারি পরীক্ষাগার করোনা পরীক্ষায় সরকার নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত এক থেকে দেড় হাজার টাকা আদায়। প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগারের

[১৯২]কালের কণ্ঠ, "৫ শ টাকার গগলস ৫০০০, ২ হাজারের পিপিই ৪৭০০", ৪ জুন ২০২০ (বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/06/04/918961) এবং সমকাল, "স্বাস্থ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অ্যাকশন শুরু", ৫ জুন ২০২০ (বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/bangladesh/article/200625567)

সংখ্যা কম থাকায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষার বিষয়টিকে পুঁজি করে বিভিন্ন পরীক্ষাগারের সামনে থাকা দালাল কর্তৃক সিরিয়াল বিক্রি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ এক থেকে দেড় হাজার টাকায় এই সিরিয়াল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া বিদেশ যাওয়ার ছাড়পত্র পেতে অনেক মানুষ 'করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নয়' এমন সার্টিফিকেট কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

১০.৬.৫ ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা: গবেষণা এলাকার শতকরা ৮২ শতাংশ এলাকায় সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এবং প্রায় ৪২ শতাংশ এলাকার ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে কোনো তালিকা অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া গবেষণা অন্তর্ভুক্ত এলাকার শতভাগ ক্ষেত্রেই অতি দরিদ্রদের নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে।নগদ সহায়তার তালিকায় বিত্তশালী ও জনপ্রতিনিধিদের সচ্ছল আত্মীয়স্বজনের নাম থাকা এবং একই মোবাইল নম্বর ২শ' জন উপকারভোগীর নামের বিপরীতে ব্যবহৃত হওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে। প্রায় সকল গবেষণা এলাকার ক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণে সামাজিক দূরত্ব না মানার অভিযোগ রয়েছে। ১০জুন ২০২০ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণে ২১৮টি দুর্নীতির ঘটনায় মোট ৪,৫৯,৮৭০ কেজি ত্রাণের চাল উদ্ধার করা হয়েছে। এসকল দুর্নীতির ঘটনায় জন প্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, জেলা পরিষদ সদস্য, পৌর কাউন্সিলর ইত্যাদি), রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, ডিলার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। এসকল দুর্নীতির ক্ষেত্রে মাত্র ৪ শতাংশ এলাকায় জড়িত সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.৭ জবাবদিহিতার ঘাটতি: করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতির উদ্দেশ্যে কিছু কার্যক্রম সম্প্রসারণ না করে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং এই দুর্যোগকালীন সময়ে অনিয়ম-দুর্নীতি করলেও দায়ি ব্যক্তিদের যথাযথ জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যথাযথভাবে আন্তঃ জেলা চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রারম্ভিক পর্যায়ে পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করা, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ না করা, এন-৯৫ মাস্ক ক্রয়ে দুর্নীতি, নিম্নমানের পিসিআর মেশিন ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়ি ও জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় নি। উপরন্তু সরবরাহকৃত মাস্ক ও সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণে বিভিন্ন জায়গায় চারজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (বদলি, কারণ দর্শানো নোটিশ, ওএসডি) গ্রহণ করা হয়েছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সীমিত আকারে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা অনেকক্ষেত্রেই লোকদেখানো (যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে দ্রুততার সাথে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের ৬ জন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা, সাময়িক বহিষ্কার), এবং এসব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সরকারি প্রেস ব্রিফিং-এ সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা ও দুর্নীতিগ্রস্তের বদলে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসার প্রবণতা - প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

সারণী: সুশাসনের সূচকের ভিত্তিতে গবেষণার পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ

সুশাসনের সূচক	পর্যবেক্ষণ
আইনের শাসন	করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ যথাযথ অনুসরণে ঘাটতি
দ্রুত সাড়াদান	আইন সংশোধন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কমিটি গঠন, প্রবেশপথ বন্ধ ও স্ক্রিনিং, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কমিটি গঠন, অভ্যন্তরীণ চলাচল ও জন-সমাগম নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষাগার ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব এবং করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা এবং ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির প্রস্তুতিতে ঘাটতি লক্ষণীয়।
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	▪ অকার্যকর কমিটি, সংক্রমণ বিস্তার রোধে সক্ষমতা, এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে সংক্রমণ বিস্তার রোধ করা যায় নি ▪ পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতির কারণে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করতে না পারায় সংক্রমণের বিস্তার লাভ ▪ চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতির কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যাহত এবং বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতা করোন ভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার রোধে গৃহীত কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে যায় এবং বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করার কারণে চিকিৎসা সেবা বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়
স্বচ্ছতা	তথ্য প্রকাশে বিধি-নিষেধ আরোপ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা এবং করোন ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ঘাটতির মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা

অনিয়ম ও দুর্নীতি	করোনা আক্রান্তের পরীক্ষা ও চিকিৎসা, সুরক্ষা ও চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা সামগ্রী বন্টণে অনিয়ম করোনা মোকাবিলা কার্যক্রমকে আরও বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে এবং ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে উপযুক্ত মানুষ ত্রাণ বঞ্চিত
জবাবদিহিতা	অভ্যন্তরীণ চলাচল নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ না করা, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা, চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়ে দুর্নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়ি ও জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় না আনা। দুর্নীতিগ্রস্তের বদলে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসার প্রবণতা - প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করে।

একাদশ অধ্যায়

উপসংহার

১১.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়। দীর্ঘসময় ধরে পরিকল্পনাহীনতা, সুশাসনের ঘাটতি ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল সক্ষমতা করোনার সঙ্কটে উন্মোচিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি প্রকটভাবে লক্ষ করা গেছে। চীন দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবের পর তিনমাস সময় হাতে পেয়েও করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় এবং সুশাসনের ঘাটতির কারণে দেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে প্রস্তুতিহীনতা, সমন্বয়হীনতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতাঅন্যদিকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাগারের সম্প্রসারণ না করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা, এবং কঠোরভাবে চলাচল নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে সংক্রমণ সারা বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছে। লকডাউনসহ সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলা-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। স্বাস্থ্যখাতের ক্রয়ে দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণের জন্য করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। ব্যাপক সামাজিক সম্পৃক্ততা বা অংশগ্রহণের অভাব, এবং মাঠ পর্যায়ে করোনা সম্পর্কিত তথ্য প্রচারণায় ঘাটতির কারণে জনসাধারণে মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় এবং কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। দায়িত্বহীনতা এবং দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষাসামগ্রীর সংকট ও পরবর্তীতে মানহীন সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখিন হয় এবং যা চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি করে। লকডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্রকল্পসমূহ একদিকে ব্যবসায়ীবান্ধব ও ঋণভিত্তিক এবং অন্যদিকে অতি দরিদ্রদের জন্য এই আর্থিক সহায়তা অপ্রতুল। ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ তৈরির কারণে এই প্রণোদনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। করোনা মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে অনিয়ম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করা হচ্ছে এবং দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় না নিয়ে এসে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীকে হয়রানি ও নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা প্রকারান্তরে দুর্নীতিকে উৎসাহ প্রদান করছে।

১১.২ সুপারিশ:সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ কর্তৃক করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো-

১. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিদ্যমান যন্ত্রপাতি ও জনবলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা জেলা পর্যায়ে আরও সম্প্রসারণ করতে হবে, এবং বিদ্যমান সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে

২. বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার ও মৃত্যুর সময়ে লকডাউন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হবে; লকডাউন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং পরীক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে সংক্রমণের ব্যাপকতার নিরিখে এলাকাভিত্তিক ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে

৩. করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে

৪. স্বাস্থ্য খাতে জেলা পর্যায়ে সার্বিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে (জিডিপির ৫%), এবং স্বাস্থ্যখাতের ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে

৫. স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে অনিয়ম দুর্নীতি রোধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

৬. সকল পর্যায়ের হাসপাতালসমূহে স্ক্রিনিং ও ট্রায়াজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে; সম্মুখ সারির সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে

৭. সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে সরকারি বিধির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সকল বেসরকারি হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে

৮. সকল হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের চিকিৎসার পাশাপাশি অন্যান্য রোগের জন্য নিয়মিত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। সংকটাপন্ন রোগীর চিকিৎসায় অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

৯. ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে

১০. অতি দরিদ্র এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, দিনমজুরদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে; চলতি কৃষি ঋণ মওকুফ করতে হবে

১১. ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষার উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে; ত্রাণ বা নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

১২. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

১৩. স্বাস্থ্যবিধির সফল বাস্তবায়নে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে

১৪. তথ্য প্রকাশ এবং তথ্যে প্রবেশগম্যতার সুবিধার্থে ও ম্যানেজমেন্টের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের স্বার্থে গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে

১৫. ত্রাণ বিষয়ক দুর্নীতির সাথে জড়িত জনপ্রতিনিধি যাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তাদের আইনগতভাবে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে